সৈয়দ মুজতবা আলী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬৩।

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২।

মুদ্রাকর—প্রভাতচন্দ্র রায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৫, চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা ৯।

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
বনবিহারী ঘোষ।

মানচিত্র-অঙ্কন
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও।
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

সাড়ে তিন টাকা

বাবা ফিরোজ,

ভ্রমণ-কাহিনী তুমি যেদিন প্রথম পড়তে শুরু করবে সেদিন খুব সম্ভব আমি গ্রহ-সূর্যে তারায়-তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে বড় মজার ভ্রমণ—তাতে টিকিট লাগে না, 'ভিজার'ও দরকার নেই। কিন্তু, হায়, সেখান থেকে ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। ফেরবারও উপায় নেই।

তাই এই বেলাই এটা লিখে রাখছি।

শান্তিনিকেতন
পৌষপার্বণ, ১৩৬৩

তোমার
আব্বু

১
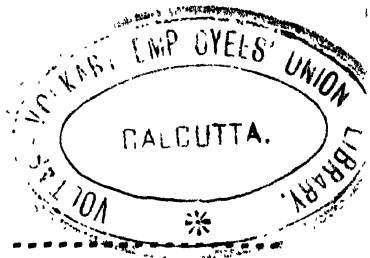
বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়ই এক হুলস্থুল ব্যাপার, তুমুল কাণ্ড! তাতে দুটো জিনিস সক্কলেরই চোখে পড়ে; সে দুটো—ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি।

তোমাদের কারো কারো হয়তো ধারণা যে স্যায়েব-সুবোরা যাবতীয় কাজকর্ম সারা করে যতদূর সম্ভব চুপিসারে আর আমরা চিৎকারে চিৎকারে পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ না করে কিছুই করে উঠতে পারিনে। ধারণাটা যে খুব ভুল সে কথা আমি বলবো না। সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছ, ইংরেজরা ব্যান্‌কুয়েট (ভোজ) খায় কি রকম কোনো প্রকারের শব্দ না করে। বাটলাররা নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে, ছুরিকাঁটার সামান্য একটু ঠুং-ঠাং, কথাবার্তা হচ্ছে মৃদু গুঞ্জরণে, সব-কিছু অতিশয় পরিপাটি, ছিমছাম।

আর আমাদের দাওয়াতে, পাল-পরবের ভোজে, যগ্যির নেমন্তন্নে?

তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে? বিশেষ করে এ-সব বিষয়ে আমার গুরু সুকুমার রায় যখন তাঁর অজর অমর বর্ণনা প্ল্যাটিনামাক্ষরে রেখে দিয়ে গিয়েছেন। শোনো:

> 'এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
> সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!
> কেহ কহে 'দৈ আন্' কেহ হাঁকে 'লুচি'
> কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
> হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
> হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।

কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা
অনাহারে কত ধারে হল প্রাণহত্যা।'

বলে কি! ভোজের নেমন্তন্নে অনাহারে প্রাণহত্যা! আলবাৎ। না হলে বাঙালীর নেমন্তন্ন হতে যাবে কেন? পছন্দ না হলে যাও না ফাপ্পোতে। খাও না আলোনা, আধাসেদ্ধ শূয়ারের মুণ্ডু কিম্বা কিসের যেন ন্যাজ!

কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা।

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়ে ইটালির জাহাজ ছাড়তে দেখেছি—জাহাজে বন্দরে, ডাঙায় জলে উভয় পক্ষের খালাসীরা মাক্কারনি-খেকো খাঁটি ইটালিয়ান; আমি মার্সেলেসের বন্দরেও ঐ কর্ম দেখেছি—উভয় পক্ষের খালাসীরাই ব্যাঙ-খেকো সরেস ফরাসিস্; আমি ডোভারে দাঁড়িয়ে ঐ প্রক্রিয়াই সাতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি—দু পক্ষের বাঁদরগুলোই বীফস্টিক-খেকো খাটাশ-মুখো ইংরেজ। আর গঙ্গায়, গোয়ালন্দে, চাঁদপুরে, নারায়ণগঞ্জে যে কত-শত বার এই লড়াই দেখেছি তার তো লেখাজোখা নেই। উভয় পক্ষে আমারই দেশভাই জাতভাই দাড়ি-দোলানো, লুঙি-ঝোলানো সিলট্যা, নোয়াখাল্যা।

বন্দরে বন্দরে তখন যে চিৎকার, অট্টরব ও হুঙ্কারধ্বনি ওঠে সে সর্বত্র একই প্রকারের। একই গন্ধ, একই স্বাদ। চোখ বন্ধ করে বলতে পারবে না, নারাণগঞ্জে দাঁড়িয়ে চাঁটগাঁইয়া শুনছো, না হামবুর্গে জর্মন শুনছো।

ডেকে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় তোমার মনে এই ধারণা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, জাহাজ এবং ডাঙার, উভয়ের পক্ষে খালাসীরা একমত হয়ে জাহাজটাকে ডাঙার দড়াদড়ির বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি দিতে চায়। কিন্তু ঐ তো মারাত্মক ভুল করলে, দাদা! আসলে দু পক্ষের মতলব একটা খণ্ডযুদ্ধ লাগানো। জাহাজ ছাড়ানো-বাঁধানো নিছক একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে খালাসী

জাহাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তুর্কী ঘোড়ার তেজে ছুটছে, সে যে মাঝে মাঝে ডাঙার খালাসীর দিকে মুখ খিঁচিয়ে কি বলছে তার শব্দ সেই ধুন্দুমারের ভিতর শোনা যাচ্ছে না সত্যি কিন্তু একটু কল্পনাশক্তি এবং ঈষৎ খালাসী মনস্তত্ত্ব তোমার রপ্ত থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তার অতিশয় প্রাঞ্জল বক্তব্য, 'ওরে ও গাড়ুগুর্ম ইস্টুপিড, দড়িটা যে বাঁ দিকে গিঁঠ খেয়ে গিয়েছে, সেটা কি তোর চোখে মাস্তুল গুঁজে দেখিয়ে দিতে হবে। ওরে ও'—(পুনরায় কটু-বাক্য)—

এই মধুরসবাণীর জুতসই সদুত্তর যে ডাঙার কনে-পক্ষ চড়াকসে দিতে পারে না, সে কথা আদপেই ভেবো না। অবশ্য তারও গলা শুনতে পাবে না, শুধু দেখতে পাবে অতি রমণীয় মুখভঙ্গি কিম্বা মুখ-বিকৃতি—'তোমরা যা বলো, তা-ই বলো'—

জাহাজের দিকে মুখ তুলে ফ্যাঁচ করে খানিকটে থুথু ফেলে বললে, 'ওরে মর্কটস্য মর্কট, তোর দিকটা ভালো করে জড়িয়ে নে না। জাহাজের টানে এ-দিকটা তো আপনার থেকেই খুলে যাবে। একটা দড়ির মনের কথা জানিসনে আর এসেছিস জাহাজের কামে। তার চেয়ে দেশে গিয়ে ঠাকুরমার উকুন বাছতে পারিসনে? ওরে ও হামান-দিস্তের থ্যাঁৎলামুখো'—(পুনরায় কটু বাক্য)—

একটুখানি কল্পনার সাবান হাতে থাকলে ঐ অবস্থায় বিস্তর বাস্তবের বুদ্বুদ ওড়াতে পারবে।

ওদিকে এসব কলরব—মাইকেলের ভাষায় 'রথচক্র-ঘর্ঘর-কোদণ্ড-টঙ্কার' ছাপিয়ে উঠছে ঘন ঘন জাহাজের ভেঁপুর শব্দ—ভোঁ, ভোঁ,—ভোঁ, ভোঁ—

তার অর্থ, যদি সে ছোট জাহাজের প্রতি হয়, 'ওরে ও ছোকরা, সর না। আমি যে এক্ষুণি ওদিকে আসছি দেখতে পাচ্ছিসনে? ধাক্কা লাগলে যে সাড়ে বত্রিশভাজা হয়ে যাবি তখন কি টুকরোগুলো জোড়া লাগাবি গাঁদাপাতার রস দিয়ে?' আর যদি তোমার [illegible]

চেয়ে বড় জাহাজ হয়, তবে তার অর্থ, 'এই যে, দাদা, নমস্কারম্। একটু বাঁ দিকে সরতে আজ্ঞে হয়, আমি তা হলে ডান দিকে সুড়ুৎ করে কেটে পড়তে পারি।' এবং এই ভেঁপু বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে। প্রত্যেক জাহাজের মাঝিমাল্লারা আপন ভেঁপুর শব্দ চেনে। কেউ যদি তখনো বন্দরের কোনো কোণে আনন্দরসে মত্ত হয়ে থাকে, তবে ভেঁপুর শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ তার চৈতন্যোদয় হয় এবং জাহাজ ধরার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়।

আমি একবার একজন খালাসীকে সাঁতরে এসে জাহাজে উঠতে দেখেছি। তখন তার আর সব খালাসী ভাইয়ারা যা গালিগালাজ দিয়েছিল তা শুনে আমি কানে আঙুল দিয়ে বাপ বাপ করে সরে পড়েছিলুম। ইংরাজিতে বলে, 'হি ক্যান্ স্যুয়ার লাইক্ এ সেলার' অর্থাৎ খালাসীরা কটু বাক্য বলাতে এ দুনিয়ার সব চাইতে ওস্তাদ। ওরা যে ভাষা ব্যবহার করে সেটা বর্জন করতে পারলে দেশ-বিদেশে তুমি মিষ্টভাষীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

তোমার যদি ফার্সী-পড়নে-ওলা ক্লাস-ফ্রেণ্ড থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'ইস্‌কন্দর-ই-রূমীরা পুরসীদ'—অর্থাৎ 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল'—দিয়ে যে গল্প আরম্ভ, তার গোটাটা কি? গল্পটা হচ্ছে, সিকন্দরশাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "ভদ্রতা আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "বে-আদবদের কাছ থেকে?" "সে কি প্রকারে সম্ভব?" "তারা যা করে আমি তাই বর্জন করেছি।"

খুব যে একটা দারুণ চালাক গল্প হল তা বলছিনে। তবে জাহাজের খালাসীদের—বিশেষ করে ইংরেজ খালাসীদের—ভাষাটা বর্জন করলেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

জাহাজের সিঁড়ি ওঠার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখবে দু-একটা লোক এক লাফে তিন ধাপ ডিঙোতে ডিঙোতে জাহাজে উঠছে। এরা কি একটু সময় করে আগে-ভাগে আসতে পারে না? আসলে তা

নয়। কোনো বেচারীকে কাস্টমস্-অপিস (যারা আমদানী-রপ্তানী মালের উপর কড়া নজর রেখে মাশুল তোলে) আটকে রেখেছিল, শেষ মুহূর্তে খালাস পেয়েছে, কেউ বা আধ ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছে কোনো যাত্রী এ জাহাজে যাবে না বলে খালি বার্থটা সে পেয়ে গিয়েছে কিম্বা কেউ শহর দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কোনো গতিকে এইমাত্র বন্দর আর জাহাজ খুঁজে পেয়েছে।

'বদর বদর' বলে জাহাজ বন্দরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে যাওয়ার ঔৎসুক্য এক দিকে আছে আবার ডাঙা থেকে ছুটি নেবার সময় মানুষের মন সব সময়ই একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে। অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সীমার শেষের দিগ্বলয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুক্ত মনের যত অগাধ আনন্দই পাও না কেন, ঝঞ্ঝাবাত্যার সঙ্গে দুর্বার সংগ্রাম করে করে ক্ষণে-বাঁচা ক্ষণে-মরার অতুলনীয় যত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করো না কেন, মাটির কোলে ফিরে আসার মত মধুময় অভিজ্ঞতা অন্য কিছুতেই পাবে না। তাই ভ্রমণকারীদের গুরু, গুরুদেব বহু নদ-নদী সাগর-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পর বলেছেন,—

'ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

আমি জাহাজের পিছন দিকে রেলিঙের উপর ভর করে তাকিয়ে রইলুম আলোকমালায় সুসজ্জিত মহানগরীর—পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দরের দিকে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায়, সমুদ্রের জাহাজে জাহাজে আর জেলেদের ডিঙিতে ডিঙিতে কোথাও বা সারে সারে প্রদীপশ্রেণী আর কোথাও বা এখানে একটা, ওখানে দুটো, সেখানে একঝাঁক—যেন মাটির সাত-ভাই-চম্পা।

আমরা দেয়ালি জ্বালি বছরের মাত্র এক শুভদিনে। এখানে সম্বৎসর দেয়ালির উৎসব। এদের প্রতিদিনের প্রতি গোধূলিতে শুভ

লগ্ন। আর এদের এ উৎসব আমাদের চেয়ে কত সর্বজনীন! এতে সাড়া দেয় সর্ব ধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের নরনারী—হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টানী!

আমি জানি, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোনো কোনো ছোট্ট পাখির রঙ যে সবুজ তার কারণ সে যেন গাছের পাতার সঙ্গে নিজের রঙ মিলিয়ে দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে করে শিকরে পাখি তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে! তাই নাকি আমের রঙও কাঁচা বয়সে থাকে সবুজ—যাতে পাখি না দেখতে পায়, এবং পেকে গেলে হয়ে যায় লাল, যাতে করে পাখির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—যাতে সে যেন ঠুকরে ঠুকরে তাকে গাছ থেকে আলাদা করে দেয়, নিচে পড়ে তার আঁটি যেন নূতন গাছ গজাতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা ভুল, আমি বলি কি করে, বিজ্ঞানের আমি জানি কতটুকু, বুঝি কতখানি? কিন্তু আমার সরল সৌন্দর্য-তিয়াষী মন এসব জেনে-শুনেও বলে, 'না; পাখি যে সবুজ, সে শুধু তার নিজের সৌন্দর্য আর আমার চোখের আনন্দ বাড়াবার জন্যে। এর ভিতর ছোট হোক, বড় হোক, কোনো স্বার্থ লুকনো নেই। সৌন্দর্য শুধু সুন্দর হওয়ার জন্যই।'

ঠিক তেমনি আমি জানি, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে প্রতি গোধূলিতে যে আলোর বান জেগে ওঠে, তার মধ্যে স্বার্থ লুকনো আছে। ঐ আলো দিয়ে মানুষ একে অন্যকে দেখতে পায়, বাপ ঐ আলোতে বাড়ি ফেরে, মা তার শিশুকে খুঁজে পায়, সবাই আপন আপন গৃহস্থালীর কাজ করে; কিন্তু তবু, যখনই আমি দূরের থেকে এই আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই মনে হয় এগুলো জ্বালানো হয়েছে শুদ্ধমাত্র দেয়ালির উৎসবকে সফল করার জন্য। তার ভিতর যেন আর কোনো স্বার্থ নেই।

অকূল সমুদ্রে পথহারা নাবিক তারার আলোয় ফের পথ খুঁজে পায়। সেই স্বার্থের সত্য উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন,—

'তুমি কত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।'

বন্দরের আলোর দিকে তাকিয়ে যদি আমিও ভগবানের উদ্দেশে বলি,—

'মোরা কত আলো জ্বালিয়েছি ঐ চরণে
কি আরতির লগনে।'

তবে কি বড্ড বেশী ভুল বলা হবে ?

অনেক দূরে চলে এসেছি। পাড়ের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে এসেছে। তবু এখনো দেখতে পাই হুশ করে একখানা জেলে-ডিঙি আমাদের পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। আসলে কিন্তু সে হুশ করে চলে যায়নি। সে ছিল দাঁড়িয়েই, কারণ তার গলুই সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে, আমরা তাকে পেরিয়ে গেলুম মাত্র।

আশ্চর্য, এত রাত অবধি পাড় থেকে এত দূরে তারা মাছ ধরছে!

এখন যদি ঝড় ওঠে তবে তারা করবে কি ? নৌকো যদি ডুবে যায় তবে তারা তো এতখানি জল পাড়ি দিয়ে ডাঙায় পৌঁছতে পারবে না। তবে তারা এ রকম বিপজ্জনক পেশা নিয়ে পড়ে থাকে কেন ? লাভের আশায় ? নিশ্চয় নয়। সে তত্ত্ব আমি বিলক্ষণ জানি। আমি একবার কয়েক মাসের জন্য মাদ্রাজের সমুদ্রপাড়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলুম। তারই পাশে ছিল, একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে এক জেলেপাড়া। আমি পাকা ছটি মাস ওদের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখেছি। ওদের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমাদের গরীব চাষারাও এদের তুলনায় বড়-লোক, এমন কি, আমাদের আদিবাসীরা, সাঁওতাল ভীলেরাও এদের চেয়ে অনেক বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। তোমাদের ভিতর যারা পুরীর জেলেদের দেখেছ তারাই আমার কথায় সায় দেবে।

তবে কি এরা অন্য কোনো সুযোগ পায় না বলে এই বিপদসঙ্কুল, কঠিন অথচ দুঃখের জীবন নিয়ে পড়ে থাকে ? আমার সেই মাদ্রাজী

বন্ধু বললে, তা নয়, এরা নাকি খোলা সমুদ্র এত ভালোবাসে যে তাকে ছেড়ে মাঠের কাজে যেতে কিছুতেই রাজী হয় না। ঝড়ের সময় মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব বলে তখন উপোস করে দিন কাটাবে, ক্ষুধায় প্রাণ অতিষ্ঠ হলে, ভুখা কাচ্চাবাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পারলে সেই ঝড়েই বেরয় মাছ ধরতে আর ডুবে মরে সমুদ্রের অথৈ জলে।—তবু জল ছেড়ে ডাঙার ধান্দায় যেতে রাজী হয় না।

এবং নৌকোর মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসীদের বেলাও তাই। এদের জীবন এতখানি অভিশপ্ত নয়, জানি, কিন্তু এরাও ডাঙায় ফিরে যেতে রাজী হয় না। এমন কি, যে চাষা সাত শ পুরুষ ধরে খেতের কাজ করেছে, সেও যদি দুর্ভিক্ষের সময় দু পয়সা কামাবার জন্য সমুদ্রে যায় তবে কিছুদিন পরই তাকে আর ডাঙার কাজে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর পুরনো খালাসীদের তো কথাই নেই। গোঁপদাড়ি পেকে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল আর নোনা হাওয়ায় চামড়ার রঙটি ব্রোন্‌জের মত হয়ে গিয়েছে, আর কদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, জাহাজে কেউ চাকরি দিতে চায় না, তবু পড়ে থাকবে খিদিরপুরের এক ঘিঞ্জি আড্ডায় আর উদয়াস্ত এ-জাহাজ ও-জাহাজ করে করে বেড়াবে চাকরির সন্ধানে। ওদিকে বেশ দু পয়সা জমিয়েছে। ইচ্ছে করলেই দেশের গাঁয়ের তেঁতুল গাছতলায় নাতি-নাতনীর পাখার হাওয়া খেতে খেতে গল্পটল্প বলতে বলতে দুটি চোখ বুজতে পারে।

সমুদ্রের প্রতি এদের কেমন যেন একটা 'নেশা' আছে সে সম্বন্ধে তারা একটু লজ্জিত। কেন, তা জানিনে। তুমি যদি বলো, 'তা, চৌধুরীর পো'—চৌধুরীর পো বলে সম্বোধন করলে ওরা বড় খুশী হয়—'দু-পয়সা তো কামিয়েছো, আর কেন এ-জাহাজে ও-জাহাজে ঝকমারির কাজ করা। তার চেয়ে দেশে গিয়ে আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করো, আখেরের কথা ভাববার সময় কি এখনো আসেনি?'

বড় কাচুমাচু হয়ে বুড়ো বলবে, 'না, ঠাকুর, তা নয়।' দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলবে, 'আর দুটি বচ্ছর কাম করলেই সব

সুরাহা হয়ে যাবে। দু-পয়সা না নিয়ে নাতি-নাতনীদের ঘাড়ে চাপতে লজ্জা করে।'

একদম বাজে কথা। বুড়ো জাহাজের কামে ঢোকে যখন তার বয়স আঠারো। আজ সে সত্তর। এই বাহান্ন বৎসর ধরে সে দেশে টাকা পাঠিয়েছে ভালো করে ঘর-বাড়ি বানাবার জন্য, জমি-জমা কেনার জন্য। এখন তার পরিবারের এত স্বচ্ছল অবস্থা যে, ওরা জমিদারকে পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। আর বুড়ো বলে কিনা ব্যাটা-ভাইপো নাতি-নাতনী তাকে দু-মুঠো অন্ন খেতে দেবে না!

সমুদ্রের প্রতি কোনো কোনো জাহাজ-কাপ্তেনের এত মায়া যে বুড়ো বয়সে তারা বাড়ি বানায় ঠিক সমুদ্রের পাড়ে, এবং বাড়িটার ঢপ্‌ও কিম্ভূতকিমাকার! দেখতে আদপেই বাড়ির মত নয়, একদম হুবহু জাহাজের মত—অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগ রেখে যতখানি সম্ভব। আর তারই চিলকোঠায় সাজিয়ে রাখে, কম্পাস, দূরবীন, ম্যাপ, জাহাজের স্টিয়ারিঙ হুইল এবং জাহাজ চালাবার অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম। বাড়ির আর কাউকে বুড়ো সেখানে ঢুকতে দেয় না—য়ুনিফর্মপরা না থাকলে জাহাজের ও-জায়গায় তো কাউকে যেতে দেওয়া হয় না—এবং সে সেখানে পাইপটা কামড়ে ধরে সমস্ত দিন বিড়বিড় করে 'খালাসীদের' বকাঝকা করে। ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। তখন সে একাই একশ'। 'জাহাজ' বাঁচাবার জন্য সে তখন ক্ষেপে গিয়ে 'ব্রিজ'ময় দাবড়ে বেড়ায়, 'টেলিফোনে' চিৎকার করে 'এঞ্জিন-ঘরকে' হুকুম হাঁকে, 'আরো জলদি; পুরো স্পীডে', কখনো বা বরসাতিটা গায়ে চাপিয়ে 'ব্রিজ' খুলে 'ডেকের' তদারকি করে ভিজে কাঁই হয়ে ফের 'ব্রিজে' ঢুকবে। ঝড় না থামা পর্যন্ত তার দম ফেলার ফুরসৎ নেই, ঘুমুতে যাবার তো কথাই ওঠে না। ঝড় থামলে হাঁফ ছেড়ে বলবে, 'ওঃ, কি বাঁচনটাই না বেঁচে গিয়েছি। আমি না থাকলে সব ব্যাটা আজ ডুবে মরতো। আজকালকার ছোঁড়ারা জাহাজ চালাবার কিস্‌-সু-টি জানে না।' তারপর টেবিলে

বসে আঁকাবাঁকা অক্ষরে 'জাহাজের' ক্রু'দের ধন্যবাদ জানাবে, তারা যে তার হুকুম তামিল করে জাহাজ বাঁচাতে পেরেছে তার জন্য। তার পর ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার 'বেয়ারিঙ' নেবে বিস্তর ল্যাটিটুড-লঙিটুড কষে এবং শেষটায় হাঁটু গেড়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে হাই তুলতে তুলতে আপন 'কেবিনে' শুতে যাবে।

তিন দিন পরে গুম গুম করে 'জাহাজ' থেকে নেমে সে পাড়ার আড্ডায় যাবে গল্প করতে—'জাহাজ' বন্দরে এসে ভিড়েছে কি না! সেখানে সেই মারাত্মক ঝড়ের একটা ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়ে শেষটায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'আর না, এই আমার শেষ সফর। বুড়ো হাড়ে আর জলঝড় সয় না।' সবাই হা-হা করে বলবে, 'সে কি, কাপ্তেন, আপনার আর তেমন কি বয়স হল?' কাপ্তেনও 'হেঁ-হেঁ' করে মহাখুশী হয়ে 'জাহাজে' ফিরবে।

আমি আরো দুই শ্রেণীর লোককে চিনি যারা কিছুতেই বাসা বাঁধতে চায় না।

দেশ-বিদেশে আমি বিস্তর বেদে দেখেছি। এরা আজ এখানে কাল ওখানে, পরশু আরো দূরে, অন্য কোথাও। কখন কোন্ জায়গায় কোন্ মেলা শুরু হবে, কখন শেষ হবে, সব তাদের জানা! মেলায় মেলায় গিয়ে কেনা-কাটা করবে, নাচ দেখাবে, গান শোনাবে, হাত গুনবে, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন থাকবে না। গ্রীষ্মের খরদাহ, বর্ষার অবিরল বৃষ্টি সব মাথায় করে চলেছে তো চলেছে, কিসের নেশায় কেউ বলতে পারে না। বাচ্চাদের লেখা-পড়া শেখাবার চাড় নেই, তাদের অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যিরও তোয়াক্কা করে না। যা হবার হোক, বাসা তারা কিছুতেই বাঁধবে না। বাড়ির মায়া কি তারা কখনো জানেনি, কোনো দিন জানবেও না।

ইংলণ্ড দুশ' বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে এদের কোনো জায়গায় পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে দিতে। টাকা-পয়সা দিয়েছে,

কিন্তু না, না, না, এরা কিছুতেই কোনো জায়গায় কেনা-গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ইংলণ্ড যে এখনো তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা পুরো একশ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ এই বেদেরা। এরা তো আর কোনো জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকে না যে এদের বাচ্চারা ইস্কুল যাবে? শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠশালা খুলেছে, অর্থাৎ পাঠশালার মাস্টার শেলেট্-পেন্‌সিল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া লাগাচ্ছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

খোলা-মেলার সন্তান এরা,—গণ্ডীর ভিতর বন্ধ হতে চায় না।

কিন্তু এদের সবাইকে হার মানায় কারা জানো?

রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।'

এই যে আরব-সাগর পাড়ি দিয়ে আদন বন্দরের দিকে যাচ্ছি এরা সেই দেশের লোক। সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে। এরা এদিক-ওদিক যেতে যেতে কখনো ইরানের সজল উপত্যকার কাছে এসে পৌঁছেছে, কখনো লেবাননের ঘন বনমর্মরধ্বনিও শুনতে পেয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করার কণামাত্র লোভ এদের কখনো হয়নি। বরঞ্চ মরুভূমির এক মরূদ্যান থেকে আরেক মরূদ্যান যাবার পথে সমস্ত ক্যারাভান (দল) জলের অভাবে মারা গেল—এ বীভৎস সত্য তাদের কাছে অজানা নয়, তবু তারা ঐ পথ ধরেই চলবে, কোনো জায়গায় স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব তাদের মাথায় বজ্রাঘাতের ন্যায়।

জানি, এক কালে আরব দেশ বড় গরীব ছিল, কৃত্রিম উপায়ে জলের ব্যবস্থা করতে পারতো না বলে সেখানে চাষ-আবাদের কোনো প্রশ্নই উঠতো না কিন্তু হালে নজ্‌দ-হেজাজের রাজা ইবনে সউদ(১)

১। এঁর ছেলে সম্প্রতি করাচীতে বেড়াতে এসেছিলেন।

পেট্রল বিক্রি করে মার্কিনদের কাছ থেকে এত কোটি কোটি ডলার পেয়েছেন যে সে কড়ি কি করে খরচা করবেন তার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষটায় মেলা যন্ত্রপাতি কিনে তিনি বিস্তর জায়গায় জল সেঁচে সেগুলোকে খেত-খামারের জন্য তৈরী করে বেদুইনদের বললেন, তারা যেন মরুভূমির প্রাণঘাতী যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এসব জায়গায় বাড়িঘর বাঁধে।

কার গোয়াল, কে দেয় ধুনো!

সে সব জায়গায় এখন তাল গাছের মত উঁচু আগাছা গজাচ্ছে।

বেদুইন তার উট-খচ্চর, গাধা-ঘোড়া নিয়ে আগের মতই এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। উটের লোমের তাঁবুর ভিতর রাত্রিবাস করে। তৃষ্ণায় যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় তখন তার প্রিয় উটের কণ্ঠ কেটে তারই ভিতরকার জমানো জল খায়। শেষটায় জলের অভাবে গাধা-খচ্চর, বউ-বাচ্চা সহ গুষ্ঠীসুদ্ধ মারা যায়।

তবু 'পাজমিয়ে' কোথাও নীড় বানাবে না।

এই সব তত্ত্বচিন্তায় মশগূল হয়ে ছিলুম এমন সময় হুশ করে আরেকখানা জেলে-নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখি, ক্যাম্বিসের ছইয়ের নিচে লোহার উনুন জেলে বুড়ো রান্না চাপিয়েছে। কল্পনা কি না বলতে পারবো না, মনে হল ফোঁড়নের গন্ধ যেন নাকে এসে পৌঁছল। কল্পনা হোক আর যাই হোক তত্ত্বচিন্তা লোপ পেয়ে তদ্দণ্ডেই ক্ষুধার উদ্রেক হল।

ওদিকে কবে শেষ ব্যাচের শেষ ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, তত্ত্বচিন্তায় মনোবীক্ষণ বিলক্ষণ সুখনীয় প্রচেষ্টা কিন্তু ভক্ষণ-ডিণ্ডিম উপেক্ষা করা সর্বাংশে অর্বাচীনের লক্ষণ!

তবু দেখি, যদি কিছু জোটে, না হলে পেটে কিল মেরে শুয়ে পড়বো আর কি?

দশ পা যেতে না যেতেই দেখি আমার দুই তরুণ বন্ধু পল আর

পার্সি 'রামি' খেলছে। আমাকে দেখে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'গুড ঈভনিং, স্যার !'

আমি বললুম, 'হ্যালো,' অর্থাৎ 'এই যে।'

তারপর ঈষৎ অভিমানের সুরে বললুম, 'আমাকে একলা ফেলে তাস খেলছো যে বড়! জানো, তাস ব্যসন-বিশেষ, তাসে অযথা কালক্ষয় হয়, গুণীরা বলেন—'

ওরা বাধা দিচ্ছে না বলে আমাকেই থামতে হল।

পার্সি বললে, 'যথার্থ বলেছেন, স্যার !'

পল বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু স্যার, আমরা তো এতক্ষণ আপনার ডিনার জোগাড় করে কেবিনে গুছিয়ে রাখাতে—'

আমি বললুম, 'সে কি হে?'

পার্সি বললে, 'আজ্ঞে। যখন দেখলুম, আপনি ডিনারের ঘণ্টা শুনেও উঠলেন না, তখনই আমরা ব্যবস্থাটা করে ফেললুম।'

সোনার চাঁদ ছেলেরা। ইচ্ছে হচ্ছিল, দুজনকে দু-বগলে নিয়ে উল্লাসে নাগা-নৃত্য জুড়ে দি। কিন্তু বয়সে কম হলে হবে কি, ওজনের দিক দিয়ে ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী ভারিক্কি মুরুব্বি। বাসনাটা তাই বিকাশ লাভ করলো না। বললুম, 'তবে চলো, ব্রাদার্স, কেবিনে।'

২

'গড্ডলিকা-প্রবাহে' অর্থাৎ ভিড়ের সঙ্গে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয় কেন? তাতে সুবিধে এই ;—আর পাঁচ জনের যা গতি, তোমারও তাই হবে। এবং যেহেতু সংসারের আর পাঁচ জন হেসে-খেলে বেঁচে আছে, অতএব তুমিও দিব্য তাদেরই মত সুখে-দুঃখে বেঁচে থাকবে।

আর যদি গড্ডলিকায় না মিশে একলা পথে চলো তবে যেমন হঠাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতে পারো ঠিক তেমনি মোড় ফিরতেই আচমকা হয়তো দেখতে পাবে, ব্যাঘ্রাচার্য-বৃহল্লাঙ্গুল থাবা পেতে সামনে বসে ন্যাজ আছড়াচ্ছেন!

গুপ্তধনটা একা পেয়েছিল বলে সেটা যেমন তোমার একারই, ঠিক তেমনি বাঘের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে একাই।

তাই বেশীর ভাগ লোক সর্বনাশা ক্ষতির ভয়ে অত্যধিক লাভের লোভ না করে গড্ডলিকার সঙ্গে মিশে যায়।

জাহাজেও তাই। তুমি যদি আর পাঁচজনের সঙ্গে ঘুম থেকে জাগো তবে সেই ভিড়ে তুমি ঝটপট তোমার 'বেড-টী'র কাপটি পাবে না। আর যদি খুব সকাল সকাল কিম্বা আর সকলের চেয়ে দেরিতে ওঠো তবে চা'টি পেয়ে যাবে তন্মুহূর্তেই, কিন্তু আবার কোনো দিন দেখবে তখনো আগুন জ্বালা হয়নি বলে চায়ের অনেক দেরি কিম্বা এত দেরিতে উঠেছো যে 'বেড-টী'র পাট উঠে গিয়ে তখন 'ব্রেকফাস্ট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বলে তোমার 'বেড-টী' হয় মাঠে, নয় দরিয়ায় মারা গিয়েছে।

ইংরিজিতে একেই বলে, 'নো রিস্‌ক্‌, নো গেন' অর্থাৎ একটুখানি

ঝুঁকি যদি নিতে রাজী না হও তবে লাভও হবে না। লটারি জিততে হলে অন্তত একটা টিকিট কেনার রিস্‌ক্‌ নিতে হয়।

সেদিন ঝুঁকিটা নিয়ে সুবিধে হল না। চা-টা মিস্‌ করে বিরস-বদনে ডেকে এসে বসলুম।

এক মিনিটের ভিতর পল আর পার্সির উদয়।

পল ফিস-ফিস করে কানে কানে বললো, 'নূতন সব 'বার্ডি'দের—অর্থাৎ 'চিড়িয়াদের' দেখেছেন, স্যর ?'

এরা সব নবাগত যাত্রী। কলম্বোয় জাহাজ ধরেছে। বেচারীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডেক-চেয়ার পাতবার ভালো জায়গার সন্ধানে। কিন্তু পাবে কোথায়? আমরা যে আগে-ভাগেই সব জায়গা দখল করে আসন জমিয়ে বসে আছি—মাদ্রাজ থেকে।

এ তো দুনিয়ার সর্বত্র হামেশাই হচ্ছে। মীটিঙে, ফুটবলের মাঠে সর্বদাই আগে গিয়ে ভালো জায়গা দখল করার চেষ্টা সবাই করে থাকে। এমন কি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসি ঠিক দরজাটির কাছে। মা রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে বেরিয়েই সক্কলের পয়লা দেবে আমাকে।

ভালো জায়গায় বসতে পারাতে দুটো সুখ। একটা ভালো জায়গা পেয়েছে বলে এবং দ্বিতীয়টা তার চেয়েও বড়। বেশ আরাম করে বসে চিনে-বাদাম খেতে খেতে অলস নিরাসক্ত ভাবে তাকিয়ে দেখতে, অন্যেরা ফ্যা-ফ্যা করে কি ভাবে ভালো জায়গার সন্ধানে ঘুরে মরছে। পরিচিত এবং অপ্রিয় লোক হলে তো কথাই নেই। 'এই যে, ভড় মশাই জায়গা পাচ্ছেন না বুঝি?' বলে ফিক করে একটুখানি সদুপদেশ বিতরণ করে, 'কেন, ঐ দিকে তো মেলা জায়গা রয়েছে', বলে হাতখানা মাথার উপর তুলে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দেবে। তার থেকে কেউই বুঝতে পারবে না, কোন্‌ দিকে জায়গা খালি। লোকটা দৃষ্টি দিয়ে বিষবাণ নিক্ষেপ করে গজরাতে গজরাতে তোমার দৃষ্টির আড়াল হবে!

আঃ! এ সংসারে ভগবান আমাদের জন্যে কত আনন্দই না রেখেছেন! কে বলে সংসার মায়াময় অনিত্য? সে বোধ হয় ফুটবলের মাঠে কখনো ভাল সীট পায়নি।

আমি পল-পার্সিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'অদ্যকার প্রোগ্রাম কি?'

পল বললে, 'প্রথমত, জিম্‌নাস্‌টিক্‌-হলে গমন।'

'সেখানকার কর্ম-তালিকা কি?'

'একটুখানি রোইং করবো।'

'রোইং? সেখানে কি নৌকো, বৈঠে, জল আছে?'

'সব আছে, শুধু জল নেই।'

'?'

'বৈঠেগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে স্প্রিং লাগানো আছে যে জল থাকলে বৈঠাকে যতখানি বাধা দিত স্প্রিং ঠিক ততখানি দেয়। কাজেই শুকনোয় বসে বৈঠে চালানোর প্র্যাকটিস আর পরিশ্রম দুই-ই হয়।'

আমি বললুম, 'উঁহু। আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। আমাদের দেশে আমরা বৈঠে মারি দু হাত দিয়ে তুলে ধরে। তোমার কায়দাটা রপ্ত করে আমার কোনো লাভ হবে না।'

পল বললে, 'তাহলে প্যারালেল বার, ডাম্‌বেল কিছু একটা?'

'উঁহু।'

পার্সি বললে, 'তাহলে পলে আমাতে বক্‌সিং লড়বো। আপনি রেফারি হবেন।'

'আমি তো ওর তত্ত্ব কিছুই জানি নে।'

'আমরা শিখিয়ে দেব।'

'উঁহু'।'

পল তখন ধীরে ধীরে বললে, 'আসলে আপনি কোনো রকম নড়াচড়া করতে চান না। একসেরসাইজের কথা না হয় রইল কিন্তু আর সবাই তো সকাল-বিকেল জাহাজটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ দেয়

শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য। আপনি তো তাও করেন না। কেন বলুন তো?'

আমি বললুম, 'আরেক দিন হবে। উপস্থিত অন্ধকার অন্য কর্মসূচী কি?'

পার্সি বললে, 'আজ এগারোটায় লাউঞ্জে চেম্বার ম্যুজিক। তাই না হয় শোনা যাবে।'

পল আপত্তি জানালো। বললে, 'যে লোকটা বেহালা বাজায় তার বাজনা শুনে মনে হয়, দুটো হুলো বেরালে মারামারি লাগিয়েছে।'

পার্সি বললে, 'ঐ তো পলের দোষ। বড্ড পিটপিটে। আরে বাপু, যাচ্ছিস তো সস্তা ফরাসী 'মেসাজেরি মারিতিম্‌' জাহাজে আর আশা করছিস, ক্রাই্‌জলার এসে তোর কেবিনের জানলার কাছে চাঁদের আলোতে বেহালা দিয়ে সেরেনেড বাজাবেন।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে এক বুড়ি কিনে আনল এক পয়সার তেল। পরে দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে ফেরত দিতে গিয়ে বললে, 'তেলে মরা মাছি।' দোকানী বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি একটা মরা হাতি আশা করছিলে?'

পার্সি বললে, 'এইবার আপনাকে বাগে পেয়েছি, স্যর! আপনি যে গল্পটি বললেন তার যে বিলিতি মুদ্রণটি আমি জানি সে এর চেয়ে সরেস।'

আমি চোখ বন্ধ করে বললুম, 'কীর্তন করো।'

পার্সি বললে, 'এই আমাদের পলেরই মত এক পিটপিটে মেমসায়েব গিয়েছেন মোজা কিনতে। কোনো মোজাই তাঁর পছন্দ হয় না। শেষটায় সবচেয়ে সস্তায় এক শিলিঙে তিনি এক জোড়া মোজা কিনলেন। দোকানী যখন মোজা প্যাক করছে তখন তাঁর চোখে পড়ল মোজাতে অতি ছোট্ট একটি ল্যাডার—'

আমি শুধোলুম, 'ল্যাডার মানে কি? ল্যাডার মানে তো মই।'

'আজ্ঞে, মোজার একগাছা টানার সুতো যদি ছিঁড়ে যায় তবে ঐ জায়গায় শুধু পড়েনগুলো একটার উপর একটা এমন ভাবে থাকে যেন মনে হয় সিঁড়ি কিম্বা মই। তাই ওটাকে তখন ল্যাডার বলা হয়।'

আমি বললুম, 'থ্যাঙ্কিউ ; শেখা হল। তারপর কি হল ?'

'মেম বললেন, 'ও মোজা আমি নেব না, ওতে একটা ল্যাডার রয়েছে।' দোকানী বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি একটা মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন, ম্যাডাম ?'

আমি বললুম, 'সাবাস, তোমার বলা গল্পটি আমার গার্হস্থ্য সংস্করণের রাজসংস্করণ বলা যেতে পারে। তদুপরি তোমরা তো রাজার জাত।'

পার্সি বললে, 'ও কথাটা নাই বা তুললেন, স্যর !'

আমি আমার চোখ বন্ধ করে বললুম, 'জাহাজের দুর্বিষহ গতানুগতিক জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করবার জন্য কোম্পানি অন্য অন্য কি ব্যবস্থা করছেন ?

পার্সি বললে, 'সঙ্গীতে যখন পলের আপত্তি তখন আমি ভাবছি ঐ সময়টায় আমি সেলুনে চুল কাটাতে যাবো।'

আমি হন্তদন্ত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি গলা কেটে ফেললেও করতে যেয়ো না, পার্সি ! তোমার চুল কেটে দেবে নিশ্চয়ই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার 'হজামৎ'ও করে দেবে।'

'কথাটা বুঝতে পারলুম না, স্যর !'

আমি বললুম, 'ওটা একটা উর্দু কথার আড়। এর অর্থ, তোমার চুল নিশ্চয়ই কেটে দেবে ভালো করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও মুড়িয়ে দেবে।'

পার্সি আরো সাত হাত জলে। শুধোলে, 'চুল যদি ভালো করে কাটে তবে মাথা মুড়োবে কি করে ?'

আমি বললুম, 'তোমার চুল কাটবে শব্দার্থে, কিন্তু মাথা মুড়োবে

বক্রার্থে, অর্থাৎ মেটাফরিকেলি। মোদ্দা কথা, তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে। জাহাজে চুল কাটানোর দর্শনী পঞ্চ মুদ্রা।'

পল বললেন, 'সে কি স্যর? চীন দেশে তো পাঁচ টাকায় কুড়ি বার চুল কাটানো যায়!'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তাই। এমন কি বিশ্বফ্যাশানের রাজধানী প্যারিসেও চুল কাটাতে পাঁচ টাকা লাগে না। ব্যাপারটা হয়েছে কি, জাহাজের ফার্স্ট ক্লাশে যাচ্ছেন পয়সাওলা বড়লোকরা। তাঁরা পাঁচ টাকার কমে চুল কাটান না। কাজেই রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচ টাকা। আমাদের কথা বাদ দাও, এখন যদি কোন ডেকপ্যাসেঞ্জারও চুল কাটাতে যায় তবে তাকেও দিতে হবে পাঁচ টাকা।'

'তা হলে উপায়? একমাথা চুল নিয়ে লণ্ডনে নামলে, পিসিমা কি ভাববেন? তার উপর পিসিমাকে দেখবো জীবনে এই প্রথম, পিসিমার কথা উঠলে বাবা মা যে ভাবে সমীহ করে কথা বলেন তার থেকে মনে হয় তিনি খুব সোজা মহিলা নন। তা হলে পাঁচটা টাকা দরিয়ার জলে ভেসে গেল আর কি, একদম শব্দার্থে।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। জিবুটি বন্দরে চুল কাটাবে। বিবেচনা করি, সেখানে চুল কাটাতে এক শিলিঙেরও কম লাগবে।'

পল বললে, 'আমরা যখন বন্দরে রোঁদ লাগাবো তখন পার্সিটা একটা ঘিঞ্জি সলুনে বসে চুল কাটাবে। তা হলে তার উপযুক্ত শিক্ষা হয়।'

পার্সি আমার দিকে করুণ নয়নে তাকালো।

আমি বললুম, 'তা কেন? বন্দর দেখার পর তোমাতে আমাতে যখন কাফেতে বসে কফি খাবো তখন পার্সি চুল কাটাবে। চাই কি, হয়তো সলুনের বারান্দায় বসেই কফি খেতে খেতে পার্সিকে আমাদের মহামূল্যবান সঙ্গসুখ দেব, অমূল্য উপদেশ বিতরণ করবো।'

পার্সি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাও করে বললে, 'এ যাত্রায় আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে, স্যর, আমাদের যে কি হত—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিছুই হত না। আমার সঙ্গে বজর-বজর না করে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে, পাঁচ রকমের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আলাপচারি হত। অনেক দেখতে, অনেক শুনতে।'

দুজনাই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল।

আমি আরব সাগরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একখানা বিরাট কেতাব নিয়ে পড়তে লেগে গেলুম।

৩

আরবের তুলনায় বাঙালী যে অতিশয় নিরীহ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় কিন্তু আরব সাগর, সাগর হয়েও বঙ্গোপসাগরের উপসাগরের চেয়ে অনেক বেশী শান্ত এবং ঠাণ্ডা। মাদ্রাজ থেকে কলম্ব পর্যন্ত অধিকাংশ যাত্রী সী-সিকনেসে বেশ কাবু হয়ে থাকার পর এখানে তাঁরা বেশ চাঙা হয়ে উঠেছেন। উত্তর-পুব দিকে মৃদু-মন্দ মৌসুমী হাওয়া বইছে তখনো—এই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েই ভাস্কো দা গামা আফ্রিকা থেকে ভারতে পৌঁছতে পেরেছিলেন কিন্তু এই সময়ে ঐ হাওয়া ভারতের দিকে বয় সে আবিষ্কার গামার নয়। আরবরা এ হাওয়ার গতিবিধি সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকিব-হাল ছিল এবং বিশেষ ঋতুতে (মৌসুম) এ হাওয়া বয় বলে এর নাম দিয়েছিল মৌসুমী হাওয়া। ইংরিজি শব্দ 'মনসূন' এই মৌসুম শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু মৌসুমী হাওয়ার খানিকটে সন্ধান পাওয়ার পরও গামা একা সাহস করে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারেননি। আফ্রিকা থেকে এক জন আরবকে জোর করে জাহাজের 'পাইলট' রূপে এনেছিলেন।

রোমানরাও নিশ্চয়ই এ হাওয়ার খবর কিছুটা রাখতো। না হলে আরবদের বহু পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে তারা এতখানি ব্যবসা-বাণিজ্য করলো কি করে? এখনো দক্ষিণ-ভারতের বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে রোমান মুদ্রা বেরোয়।

তারও পূর্বে গ্রীক, ফিনিশিয়ানরা এঁ হাওয়ার খবর কতখানি রাখতো আমার বিদ্যে অত দূর পৌঁছয়নি। তোমরা যদি কেতাব-পত্র ঘেঁটে আমাকে খবরটা জানাও তবে বড় খুশী হই।

এই হাওয়াটাকেই ট্যারচা কেটে কেটে আমাদের জাহাজ এগোচ্ছে। এ হাওয়া যতক্ষণ মোলায়েম ভাবে চলেন ততক্ষণ কোনো ভাবনা নাই। জাহাজ অল্প-স্বল্প দোলে বটে তবু উল্টো দিক থেকে বইছে বলে গরমে বেগুন-পোড়া হতে হয় না। কিন্তু ইনি রুদ্রমূর্তি ধরলেই জাহাজময় পরিত্রাহি চিৎকার উঠবে। এবং বছরের এ সময়টায় তিনি যে মাসে অন্তত ছু-তিন বার জাহাজগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান সে সুখবরটা আব-হাওয়ার বইখানাতে একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে।

আবহাওয়ার বিজ্ঞান ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস খানিকটা দিতে পারে বটে কিন্তু আরব সাগরের মাঝখানে যে ঝড় উঠল সে যে তার পর কোন্ দিকে ধাওয়া করবে সে সম্বন্ধে আগে-ভাগে কোনো-কিছু বলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাই সে ঝড় যদি পুব দিকে ধাওয়া করে তবে ভারতের বিপদ; বোম্বাই, কারবার, তিরু অনন্তপুরম্ (শ্রীঅনন্তপুর, ট্রিভাণ্ডরম্) অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে দেবে। যদি উত্তর দিকে যায় তবে পার্শিয়ান গাল্‌ফ্ এবং আরব-উপকূলের বিপদ আর যদি পশ্চিম পানে আক্রমণ করে তবে আদন বন্দর এবং আফ্রিকার সোমালিদেশের প্রাণ যায় যায়।

একবার নাকি এই রকম একটা ঝড়ের পর সোমালিদের ওবোক শহরে মাত্র একখানা বাড়ি খাড়া ছিল! যে ঝড়ে শহরের সব বাড়ি পড়ে যায়, তার সঙ্গে যদি মাঝ দরিয়ায় আমাদের জাহাজের মোলাকাত হয় তবে অবস্থাটা কি রকম হবে খানিকটে অনুমান করা যায়।

তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এ রকম ঝড়ের সঙ্গে মানুষের এক বারের বেশী দেখা হয় না। প্রথম ধাক্কাতেই পাতাল-প্রাপ্তি!

'পাতাল-প্রাপ্তি' কথাটা কি ঠিক হল? কোথায় যেন পড়েছি,

জাহাজ ডুবে গেলে পাতাল অবধি নাকি পৌঁছয় না। খানিকটে নাবার পর ভারী জল ছিন্ন করে জাহাজ নাকি আর তলার দিকে যেতে পারে না। তখন সে ত্রিশঙ্কুর মত ঐখানেই ভাসতে থাকে।

ভাবতে কি রকম অদ্ভুত লাগে! সমুদ্রের এক বিশেষ স্তরে তাহলে যত সব জাহাজ ডোবে তারা যত দিন না জরাজীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তত দিন শুধু ঘোরাফেরাই করবে!

জলে যা, হাওয়াতেও বোধ করি তাই। বেলুন-টেলুন জোরদার করে ছাড়তে পারলে বোধ হয় উড়তে উড়তে তারা এক বিশেষ স্তরে পৌঁছলে ঐখানেই ঝুলতে থাকবে—না পারবে নিচের দিকে নামতে, না পারবে উপরের দিকে। তারই অবস্থা কল্পনা করে বোধ হয় মুনি-ঋষিরা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকার কথা কল্পনা করেছিলেন।

আমাকে অবশ্য কখনো কোনো জায়গায় ঝুলে থাকতে হবে না। দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় যা গুরুভোজন করে থাকি তার ফলে ডুবলে পাথরবাটির মত তরতর করে একদম নাক-বরাবর পাতালে পৌঁছে যাব। আহারাদির পর আমার যা ওজন হয় সে গুরুভার সমুদ্রের যে-কোনো নোনা জলকে অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। আমার ভাবনা শুধু আমার মুণ্ডুটাকে নিয়ে। মগজ সেটাতে এক রত্তিও নেই বলে সেটা এমনি ফাঁপা যে, কখন যে ধড়টি ছেড়ে হুশ করে চন্দ্র-সূর্যের পানে ধাওয়া করবে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে যদি আমাকে সনাক্ত করতে চাও তবে শুধু লক্ষ্য করো কোন্ লোকটা দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে নড়া-চড়া করছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম আমার সখা এবং সতীর্থ—একই তীর্থে যখন যাচ্ছি তখন 'সতীর্থ' বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়—শ্রীমান্ পল কোথা থেকে একটা টেলিস্কোপ যোগাড় করে একদৃষ্টে দক্ষিণ পানে তাকিয়ে আছে। ভাবলুম, ঐ

দিক দিয়ে বোধ হয় কোনো জাহাজ যাচ্ছে আর সে তার নামটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে কাছে এসে বললেন, 'ঐ দূরে যেন ল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'ল্যাণ্ড নয়, আইল্যাণ্ড। ওটা বোধ হয় মালদ্বীপপুঞ্জের কোনো একটা হবে।'

পল বললে, 'কই, ওগুলোর নাম তো কখনো শুনিনি।'

আমি বললুম, 'শুনবে কি করে? এই জাহাজে যে এত লোক,—এঁদের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করো ওঁদের কেউ মালদ্বীপ গিয়েছেন কি না?

অদ্দুরই বা কেন? শুধু জিজ্ঞেস করো, মালদ্বীপবাসী কারো সঙ্গে কখনো ওঁদের দেখা হয়েছে কি না? তাই মালদ্বীপ নিয়ে এ বিশ্বভুবনে কারো কোনো কৌতূহল নেই।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'শুনেছি, মালদ্বীপের লোকেরা খুব ধর্মভীরু হয়। এক মালদ্বীপবাসীর তাই ইচ্ছা হয়, তার ছেলেকে মুসলিম শাস্ত্র শেখাবার। মালদ্বীপে তার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তিনি ছেলেকে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান;—ঐটেই ইসলামী শাস্ত্র শেখার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলেটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় ঐখানে। বহুবার দেখা হয়েছিল বলে সে আমাকে তার দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছিল, তবে সে অনেক কাল হল বলে আজ আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

'ওখানে না কি সবসুদ্ধ হাজার দুই ছোট ছোট দ্বীপ আছে এবং তার অনেকগুলোতেই খাবার জল নেই বলে কোনো প্রকারের বসতি নেই। মালদ্বীপের ছেলেটি আমায় বলেছিল, 'আপনি যদি এ রকম দশ-বিশটা দ্বীপ নিয়ে বলেন, এগুলো আপনার, আপনি এদের রাজা তা হলে আমরা তাতে কণামাত্র আপত্তি জানাবো না।'

অন্যগুলোতেও বিশেষ কিছু ফলে না ; সবচেয়ে বড় দ্বীপটার দৈর্ঘ্য না কি মাত্র ছ'মাইল। মালদ্বীপের স্থলতান সেখানে থাকেন এবং তাঁর নাকি ছোট্ট একখানা মোটর গাড়ি আছে। তবে যেখানে সব চেয়ে লম্বা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র ছ-মাইল সেখানে ওটা চালিয়ে তিনি কি স্থখ পান তা তিনিই বলতে পারবেন।'

মালদ্বীপে আছে প্রচুর নারকেল গাছ আর দ্বীপের চতুর্দিকে জাত-বেজাতের মাছ কিলবিল করছে। মাছের শুঁটকি আর নারকোলে নৌকো ভর্তি করে পাল তুলে দিয়ে তারা রওয়ানা হয় সিংহলের দিকে মৌসুমী হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই। হাওয়া তখন মালদ্বীপ থেকে সিংহলের দিকে বয়। সমস্ত বর্ষাকালটা সিংহলে ঐ সব বিক্রি করে এবং বদলে চাল ডাল কাপড় কেরসিন তেল কেনে। কেনাকাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের নাকি সেখানে বহুদিন কাটাতে হয়, কারণ উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে শীতের শুরুতে। তার আগে তো ফেরার উপায় নেই।'

পার্সি বললে, 'কেন স্যর, এখন তো শীতকাল নয়। আমরা তো হাওয়ার উল্টো দিকেই যাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'ভ্রাতঃ, আমাদের জাহাজ চলে কলে, হাওয়ার তোয়াক্কা সে করে থোড়াই। মালদ্বীপে কোনো কলের জাহাজ যায় না, খরচায় পোষায় না বলে। তাই আজ পর্যন্ত কোনো টুরিস্ট মালদ্বীপ যায়নি।'

'তাই মালদ্বীপের ছোকরাটি আমায় বলেছিল, 'আমাদের ভাষাতে 'অতিথি' শব্দটার কোনো প্রতিশব্দ নেই। তার কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমাদের দেশে ভিনদিশী লোক আসেনি। আমরা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যা অল্পস্বল্প যাওয়া-আসা করি তা এতই কাছাকাছির ব্যাপার যে কাউকে অন্যের বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে হয় না।' তার পর আমায় বলেছিল, 'আপনার নেমন্তন্ন রইল মালদ্বীপ আসার কিন্তু আমি জানি, আপনি কখনো আসবেন না। যদিস্যাৎ এসে যান

তাই আগের থেকেই বলে রাখছি, আপনাকে এর বাড়ি ওর বাড়ি করে করে অন্তত বছর তিনেক সেখানে কাটাতে হবে। খাবেন-দাবেন, নারকোল গাছের তলাতে চাঁদের আলোয় গাওনা-বাজনা শুনবেন, ব্যস, আর কি চাই!'

'যখন শুনেছিলুম তখন যে যাবার লোভ হয়নি এ-কথা বলবো না। ঝাড়া তিনটি বচ্ছর (এবং মালদ্বীপের ছেলেটি আশা দিয়েছিল যে সেখানে যাহা তিন তাহা তিরানব্বুই) কিচ্ছুটি করতে হবে না, এবং শুধু তিন বৎসর না, বাকি জীবনটাই কিছু করতে হবে না এ-কথাটা ভাবলেই যেন চিত্তবনের উপর দিয়ে মর্মর গান তুলে মন্দমিঠে মলয় বাতাস বয়ে যায়। এগজামিনের ভাবনা, কেষ্টার কাছে দু-টাকার দেনা, সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক মুহূর্তেই মুক্তি। অহো!

'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবা-রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ॥'

এ-সব আত্মচিন্তার সব কিছুই যে পার্সিকে প্রকাশ করে বলেছিলুম তা নয়, তবে একটা কথা মনে আছে, ওরা যখন উৎসাহিত হয়ে মালদ্বীপে বাকি জীবনটা কাটাবে বলে আমাকে সে খবরটা দিলে তখন আমি বলেছিলুম,—

'বাকি জীবন কেন, তিনটি মাসও সেখানে কাটাতে পারবে না। তার কারণ যেখানে কোনো কাজ করার নেই, সেখানে কাজ না-করাটাই হয়ে দাঁড়ায় কাজের কাজ। এবং সে ভয়াবহ কাজ। কারণ, অন্য যে-কোনো কাজই নাও না কেন, যেমন মনে করো এগজামিন্—তারও শেষ আছে, বি-এ, এম-এ, পি-এইচ্-ডি,—তার পর আর কোনো পরীক্ষা নেই। কিম্বা মনে করো উঁচু পাহাড়ে চড়া। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, ত্রিশ হাজার ফুট, যাই হোক না

কেন তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু 'কাজ নেই'—এ হল একটা জিনিস যা নেই, কাজেই তার আরম্ভও নেই শেষও নেই। যে জিনিসের শেষ নেই সে জিনিস শেষ পর্যন্ত সইতে পারা যায় না।

'কিম্বা অন্য দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে পারো।

'আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনে করো একটা ঘর। ঘরে আসল জিনিস—দি ইমপর্টেণ্ট্ এলেমেণ্ট—হল তার ফাঁকাটা, আমরা তাতে আসবাবপত্র রাখি, খাই-দাই, সেখানে রৌদ্রবৃষ্টি থেকে শরীরটা বাঁচাই। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু এসব কাজে লাগছে না। অর্থাৎ ইমপর্টেণ্ট হল ফাঁকাটা, নিরেট দেয়ালটা নয়। তাই বলে দেয়ালটা বাদ দিলে চলবে না। দেয়ালহীন ফাঁকা হল ময়দানের ফাঁকা, সেখানে আশ্রয় জোটে না।

'তাই গুরুদেব বলেছেন, মানুষের জীবনের অবসরটা হচ্ছে ঘরের ফাঁকাটার মত, সেই দেয় আমাদের প্রবেশের পথ কিন্তু কিছুটা কাজের দেয়াল দিয়ে সেই ফাঁকা অবসরটাকে যদি ঘিরে না রাখো তবে তার থেকে কোনো সুবিধে ওঠাতে পারো না। কিন্তু কাজ করবে যতদূর সম্ভব কম। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো, ঘরের মধ্যে ফাঁকাটা দেয়ালের তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশী।'

তারপর আমি বললুম, 'কিন্তু, ভ্রাতৃদ্বয়, আমার গুরুদেব এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন ভারি সুন্দর ভাষায় আর সুমিষ্ট ব্যঞ্জনায়, কিছুটা উস্টার সসের হাস্যকৌতুক মিশিয়ে দিয়ে। আমি তার অনুকরণ করবো কি করে ?

'কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত এই,—মালদ্বীপের একটানা কর্মহীনতার ফাঁকাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তার চতুর্দিকে সামান্যতম কাজের দেয়াল নেই বলে।'

একটানা এতখানি কথা বলার দরুন ক্লান্ত হয়ে ডেক-চেয়ারে পা এলিয়ে দিলুম।

তখন লক্ষ্য করলুম, পল ঘন-ঘন ঘাড় নেকোচ্ছে। তার পর

হঠাৎ ডান হাতটা মুঠো করে মাথায় ধাঁই করে গুত্তা মেরে বললে, 'পেয়েছি, পেয়েছি, এই বারে পেয়েছি।'

কি পেয়েছে সেইটে আমি শুধোবার পূর্বেই পার্সি বললে, 'ঐ হচ্ছে পলের ধরন। কোনো একটা কথা স্মরণে আনবার চেষ্টা করার সময় সে ঘন-ঘন ঘাড় চুলকোয়। মনে এসে যাওয়া মাত্রই ঠাস করে মাথায় মারবে এক ঘুশি। ক্লাসেও ও তাই করে। আমরা তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকি। এইবারে শুনুন, ও কি বলে।'

পল বললে, 'কোনো নূতন কথা নয়, স্যার! তবে আপনার গুরুর তুলনাতে মনে পড়ে গেল আমাদের গুরু 'কন্‌ফুৎস'র (আমার মনে বড় আনন্দ হল যে ইংরেজ ছেলেটি কন্-ফু-ৎস'কে 'আমাদের গুরু' বলে সম্মান জানালো—ভারতবর্ষের ইংরেজ ছেলে-বুড়ো বুদ্ধকে কখনো 'আমাদের গুরু' বলেনি) এবিষয়ে অন্য এক তুলনা। যদি অনুমতি দেন—'

আমি বললুম, 'কী জ্বালা! তোমার এই চীনা লৌকিকতা—ভদ্রতা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। কন্-ফু-ৎস'র তত্ত্বচিন্তা শুনতে চায় না কোন্ মর্কট? জানো, ঋষি কন্-ফুৎস আমাদের মহাপুরুষ গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক? ঐ সময়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ইরানে জরথুস্ত্র, গ্রীসে সোক্রাতেস-প্লাতো-আরিস্ততেলেসে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভিতরে—তা থাক গে, তোমার কথা বলো।'

পল বললে, 'সরি, সরি। কন্-ফু-ৎস বলেছেন, 'একটি পেয়ালার আসল (ইমপর্টেণ্ট) জিনিস কি? তার ফাঁকা জায়গাটা, না তার পর্সেলেনের ভাগটা? ফাঁকা জায়গাটাতেই আমরা রাখি জল, শরবত, চা। কিন্তু পর্সেলেন না থাকলে ফাঁকাটা আদপেই কোনো উপকার করতে পারে না। অতএব কাজের পর্সেলেন দিয়ে অকাজের ফাঁকাটা ঘিরে রাখতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, পর্সেলেন যত পাতলা হয়,

পেয়ালার কদর ততই বেশী। অর্থাৎ কাজ করবে যতদূর সম্ভব সামান্যতম।'

তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে কাও-টাও করে অর্থাৎ চীনা পদ্ধতিতে আমাকে হাঁটু আর মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বললে,—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ফের তোমার চীনে সৌজন্য?'

বললে, 'সরি, সরি। কিন্তু স্যর ঐ মালদ্বীপের কথা ওঠাতে আর আপনি আপনার গুরুদেবের কথা বলতে আমার কাছে কন-ফু-ৎসের তত্ত্বচিন্তা আজ সরল হয়ে গেল। ওঁর এ বাণী বহু বার শুনেছি, অনেক বার পড়েছি কিন্তু আজ এই প্রথম—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'চোপ্।'

৪

কোনো কোনো জাহাজে কি যেন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাওয়াকে ঠাণ্ডা করে সেইটে জাহাজের সর্বত্র চালিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয়, এই রৌদ্র-দগ্ধ, জ্বরতপ্ত বিরাট জাহাজরূপী লৌহদানবকে তার মা যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু পারেন কতখানি? বরঞ্চ রেলগাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে ছায়াতে দু-দশ মিনিট ঠাণ্ডা হবার সুযোগ পায়, কিম্বা উপত্যকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ে এসে পাহাড়ের ছায়া পড়ে, ঘন শালবনের ভিতর দিয়েও গাড়ি কখনো কখনো বনানীর স্নিগ্ধচ্ছায়া লাভ করে, এবং সুড়ঙ্গ হলে তো কথাই নেই—সেখানকার ঠাণ্ডা তো রীতিমত বরফের বাক্সের ভিতরকারের মত—কিন্তু জাহাজের কপালে এসব কিছুই নেই। একে তো দিগ্‌দিগন্তব্যাপী জ্বলছে রৌদ্রের বিরাট চিতা, তার উপর সূর্য তার প্রতাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন সমুদ্রের জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে। কালো চশমা পরেও তখন সেদিকে তাকানো যায় না। রাত্রে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া বয় বটে, কিন্তু সে ঠাণ্ডাতে গা জুড়োবার পূর্বেই দেখা দেন পূর্বাকাশে সূর্যি-মাস্টার ফের তাঁর রোদের চাবুক হাতে নিয়ে। ভগবান তাঁকে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কর, এবং সেই লক্ষ লক্ষ হাতে তিনি নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ পাকা কঞ্চির সোনালি রঙের চাবুক। দেখা মাত্রই গায়ের সব কটা লোম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাহাজে ঠাণ্ডা বাতাস চালানোর ব্যবস্থা ছিল না—অর্থাৎ সেটা অ্যার-কণ্ডিশন্‌ড্ নয়। কাজেই কি দিনের বেলা কি

রাত্রে কখনো ভালো করে ঘুমবার সুযোগ বঙ্গোপসাগর, আরব সমুদ্র কিম্বা লাল দরিয়ায় মানুষ পায় না।

দুপুর রাত থেকে হয়তো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। ডেকে বসে তুমি গা জুড়োলে। কিন্তু তখন যে কেবিনে ঢুকে বিছানা নেবে তার উপায় নেই। সেখানে ঐ ঠাণ্ডা হাওয়া যেতে পারে না বলে অসহ্য গুমোট গরম। গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে এসে গলি-বাড়িতে ঘুমবার চেষ্টা করার সঙ্গে এর খানিকটে তুলনা হয়।

ডেকে যে আরাম করে ঘুমবে তারও উপায় নেই। ঘুমলে হয়তো রাত দুটোর সময়। চারটে বাজতে না বাজতেই খালাসীরা ডেকে বালতি বালতি জল ঢেলে সেখানে যে বন্যা জাগিয়ে তোলে তার মাঝখানে মাছও ঘুমতে পারে না। তখন যাবে কোথায়? কেবিনে ঢুকলে মনে হবে যেন রুটি বানানোর তন্দুরে—আভ্‌নে—তোমাকে রোস্ট করা হবে।

এই অবস্থা চলবে ভূমধ্যসাগর না পৌঁছন পর্যন্ত।

তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে, তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডা-গরম সম্বন্ধে আমাদের মত এতখানি সচেতন নয়। পল পার্সি তাই যখন কেবিনের ভিতর নাক ফরফরাতো আমি তখন ডেকে বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। তখন বই পড়তে কিম্বা দেশের আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে ডেক-চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তুম।

একদিন কেন জানিনে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই সামনে দেখি এক অপরূপ মূর্তি!

ভদ্রলোক কোট-পাতলুন-টাই পরেছেন ঠিকই কিন্তু সে পাতলুন ঢিলে পাজামার চেয়েও বোধ করি চৌড়া, কোট নেবে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আর মান-মুনিয়া দাড়ির তলায় টাইটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে মাত্র। ওঁর বেশভূষায়—ভুল করলুম; 'ভূষা'-জাতীয়

কোনো বালাই ওঁর বেশে ছিল না—অনেক কিছুই দেখবার মত ছিল কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমি সব-কটা লক্ষ্য করিনি, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করে করে অনেক-কিছুই শিখেছিলুম। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম, তাঁর কোটে ব্রেস্‌ট্ পকেট বাদ দিয়েও আরো দু সারি ফালতো পকেট। তাই বোধ হয়, কোটটা দৈর্ঘ্যে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

এঁকে তো এতদিন জাহাজে দেখিনি! ইনি ছিলেন কোথায়? তবে কি ইনি কলম্বতে উঠেছেন? তা হলেও এ দুদিন ইনি ছিলেন কোথায়?

ভদ্রলোক সোজাসুজি বললেন, 'গুড নাইট।'

বিলিতি কায়দা-কেতা যদিও আমি ভালো করে জানিনে তবু অন্তত এইটুকু জানি যে 'গুড নাইট' ওদেশে বিদায় নেবার অভিবাদন —আমরা যে রকম যে কোনো সময় বিদায় নিতে হলে বলি, 'তবে আসি।' দেখা হওয়া মাত্রই কেউ যদি বলে, 'তবে এখন আসি' তবে বুঝবো লোকটা বাঙালী নয়। তাই তাঁর 'গুড নাইট' থেকে অনুমান করলুম, ইনি যদিও বিলিতি বেশ ধারণ করেছেন তবু আসলে ভারতীয়।

আমি বললুম, 'বৈঠিয়ে।'

আমার বাঁদিকে পার্সির শূন্য ডেক-চেয়ার। তিনি তার-ই উপরে বসে পড়ে আমাকে বললেন, 'আমার নাম আবুল্ আস্‌ফিয়া, নূর উদ্দীন, মুহম্মদ আব্দুল করীম স্বিদ্দীকী।'

আমার অজানাতেই আমি বলে ফেলেছিলুম 'বাপ্‌স্'। কেন, সে কথা কি আর খুলে বলতে হবে? তবু বলি।

আমি মুসলমান। আমার নাম সৈয়দ মুজতবা আলী, আমার পিতার নাম সৈয়দ সিকন্দর আলী। আমার ঠাকুরদাদার নাম সৈয়দ মুশর্‌রফ্ আলী। ভারতীয় মুসলমানের নাম সচরাচর তিন শব্দেই শেষ হয়। তাই এঁর আড়াইগজী নামে যে আমি হক্‌চকিয়ে যাব তাতে আর বিচিত্র কি?

বিবেচনা করি, তিনিও বিলক্ষণ জানতেন। কারণ চেয়ারে বসেই, তিনি তাঁর অন্যতম পকেট থেকে বের করলেন একটি সুন্দর সোনার কেস্। তার থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে, আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নামটা একটু লম্বা। তাই এইটে নিন।'

আমি তো আরো অবাক। ভিজিটিং কার্ডের কেস্ হয় তা আমি জানি। কারণ, ভিজিটিং কার্ড সুন্দর সুচিক্কণ। যাঁদের তা থাকে তাঁদের কেউ কেউ সেটা কেসে রাখেন। যেমন মনে করো, ইনশিওরেন্সের দালাল, খবরের কাগজের সংবাদদাতা কিংবা ভোটের ক্যানভাসার। কিন্তু ওঁদেরও তো কেস্ দেখেছি জর্মন সিলভারের তৈরী। ভিজিটিং কার্ডের সোনার কেস পূর্বে আমি কখনো দেখিনি।

সেই বিস্ময় সামলাতে না সামলাতেই তিনি আরেক পকেটে হাত চালিয়ে ডুবুরির মত গভীর তল থেকে বের করলেন এক সোনার সিগারেট কেস্। ও রকম কেস আমি শুধু স্বপ্নে আর সিনেমায় ফিল্ম-স্টারদের হাতে দেখেছি, বাস্তবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। ডেকের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ আলোতেও সেটা যা ঝলমল করে উঠলো তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় শুধু স্যাকরা-বাড়ি থেকে সদ্য-আসা গয়নার সঙ্গে। কেসের এক কোণে আবার কি যেন এক নীল রঙের পাথর দিয়ে আল্পনা এঁকে ইংরিজি অক্ষরে ভদ্রলোকের সেই লম্বা নামের গুটি দু-তিন আদ্যক্ষর। কেসটি আবার সাইজেও বিরাট। নিদেন পক্ষে ত্রিশটি সিগারেট ধরবে। আমার সামনে কেসটি খুলে ধরে আরেক পকেট থেকে বের করলেন একটি লাইটার। তার উপরে জয়পুরী মিনার কাজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জমিদারবাড়ির বড় গিন্নিমার কবচ কিম্বা মাদুলি।

আমার মনের ভিতর দিয়ে হুড়-হুড় করে এক পল্টন সেপাইয়ের মত পঞ্চাশ সার প্রশ্ন চলে গেল।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ রকম লজঝড় কোট-পাতলুনের

ভিতর অত সব সুন্দর সুন্দর দামী দামী জিনিস লোকটা রেখেছে কেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন সব দামী মাল যার পকেটে আছে, সে ফার্স্ট ক্লাসে না গিয়ে, আমার মত গরীবের সঙ্গে টুরিস্ট্ ক্লাসে যাচ্ছে কেন ?

তৃতীয় প্রশ্ন—তা সে যাক্ গে। কারণ সব কটা প্রশ্নের পুরো ফর্দ এখানে দিতে গেলে আমার বাকি দিনটা কেটে যাবে। আর তোমাদেরও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, ভদ্রলোকের বর্ণনা শুনে তোমাদের মনেও সেই সব প্রশ্ন জাগবে যেগুলো আমার মনে জেগেছিল। তবে আর সেগুলো সবিস্তর বলি কেন ?

কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই কি প্রকারে ?

তিনি বয়সে আমার চেয়ে ঢের বড়। তিনি যদি আলাপচারী আরম্ভ না করেন তবে আমি তাঁকে প্রশ্ন শুধাই কি করে ? মুরুব্বিদের আদেশ, ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি, বড়রা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন— ছোটরা উত্তর দেবে। সে আদেশ লঙ্ঘন করবো কি করে ? বিশেষ করে বিদেশে, যেখানকার কায়দা-কেতা জানিনে। সেখানে দেশের গুরুজনদের আদেশ স্মরণ করা ভিন্ন অন্য পুঁজি আছে কি ?

আধ ঘণ্টাটাক কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আমি তাঁর দু-দুটো সিগারেট পুড়িয়েছি। ফের যখন তৃতীয়টা বাড়িয়ে দিলেন তখন আমাকে বেশ দৃঢ় ভাবে 'না' বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে সাহস সঞ্চয় করে শুধালুম, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?'

যেন প্রশ্ন শুনতে পাননি। আমিও চাপ দিলুম না।

আমি খানিকক্ষণ পরে বললুম, 'মাফ করবেন, আমি শুতে চললুম, গুড নাইট।' বললেন, 'গুড নাইট।'

কী জানি, লোকটা কেন কথা বলে না। বোধ হয় জিভে বাত হয়েছে। কিম্বা হয়তো ওর দেশে কথা বলাতেও রেশনের আইন চলে। যাক্ গে, কি হবে ভেবে।

পরদিন সকালবেলা পল পার্সিকে নিয়ে আমি যখন সংসারের

যাবতীয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন এবং সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় সেই ভদ্রলোক এসে আবার উপস্থিত। আমি ওদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিতেই তিনি তাঁর আরেকটা পকেটে হাত চালিয়ে বের করলেন একরাশ সুইস চকলেট, ইংরিজি টফি এবং মার্কিন চুইংগাম্। পল পার্সি গুটি কয়েক হাতে তুলে নিয়ে যতই বলে, 'আর না, আর না', তিনি কিন্তু বাড়ানো হাত গুটোন না। ওদিকে মুখে কোনো কথা নেই। শেষটায় বিষণ্ণ বদনে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমরা খানিকটে ইতি-উতি করে পুনরায় নিজেদের গল্পে ফিরে গেলুম। তখন দেখি, ভাষণে অরুচি হলেও তিনি শ্রবণে কিছুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ নন। আমাদের গল্পের মাঝে মাঝে তাগমাফিক 'হুঁ', 'হাঁ' দিব্যি বলে যেতে লাগলেন। তারপর আমাদের তিন জনকে কিছুতেই 'লাইম স্কোয়াশ' খাওয়াতে না পেরে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন।

উঠে যাওয়া মাত্রই আমি পলকে শুধালুম, 'এ কি রকম চিড়িয়া হে?'

পল বললে, 'কলম্বতে উঠেছেন। পকেট-ভর্তি ছুনিয়ার সব টুকিটাকি, মিষ্টি-মিঠাই। যার সঙ্গে দেখা তাকেই কিছু-না-কিছু একটা অফার করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে কথা বলতে শুনিনি।'

আমি বললুম, 'জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে তো।'

পল বললে, 'উত্তর কি পাবেন?'

বললুম, 'ঠিক বলেছো, কাল রাত্রে তো পাইনি।'

এঁর সম্বন্ধে যে এত কথা বললুম, তার কারণ এঁর সঙ্গে পরে আমাদের খুব বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল ; সে কথা সময় এলে হবে।

৫

পল বিজ্ঞ কণ্ঠে বললে, 'কলম্বো থেকে আদন বন্দর ২০৮২ মাইল রাস্তা। জাহাজে ছদিন লাগে। মাঝখানে দ্বীপ-টীপ নেই, অন্ততঃ আমার ম্যাপে নেই। তবে আদনের ঠিক আগেই সোকোত্রা দ্বীপ। সেটা হয়তো দেখতে পাবো।'

আমি বললুম, 'যদি রাত্রিবেলা ঐ জায়গা দিয়ে যাই তবে দেখবে কি করে? আর দিনের বেলা হলেও অতখানি পাশ দিয়ে বোধ হয় জাহাজ যাবে না। তার কারণ, বড় বড় দ্বীপের আশ-পাশে বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপও জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। এর কোনটার সঙ্গে জাহাজ যদি ধাক্কা খায় তবে আর আমরা সামনের দিকে এগবো না—এগিয়ে যাবো তলার দিকে।'

এদিকে কথা বলে যাচ্ছি, ওদিকে আমার বার বার মনে হতে লাগলো, সোকোত্রা নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার বাবার মাসী, মেসোমশাই তাঁদের দুই ছেলেকে নিয়ে গত শতকের শেষের দিকে মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন এবং আমার খুব ছেলেবেলায় তাঁর কাছ থেকে সে ভ্রমণের অনেক গল্প আমি শুনেছিলুম। আমার এই দাদীটি ছিলেন গল্প বলায় ভারি ওস্তাদ। রাত্রির রান্না না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের গল্প বলে বলে দিব্য জাগিয়ে রাখতে পারতেন এবং যেই চাচীরা খবর দিতেন, রান্না তৈরী, অমনি তিনি বেশ কায়দা করে গল্পটা শেষ করে দিতে পারতেন! আমরা টেরই পেতুম না, আমাদের সামনে তিনি একটা ন্যাজকাটা হনুমান রেখে চলে গেলেন। আমাদের মনে হত গল্পটা যেন একটা আস্ত ডানা-কাটা পরী!

সেই দাদীর মুখে শুনেছিলুম, সোকাত্রার কাছে এসে নাকি যাত্রীদের মুখ শুকিয়ে যেত। জলের স্রোতের তোড়ে আর পাগলা হাওয়ার থাবড়ায় জাহাজ নাকি হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়তো কোনো একটা ডুবন্ত দ্বীপের ঘাড়ে আর হয়ে যেত হাজারো টুকরোয় খানখান। কেউ বা জাহাজের তক্তা, কেউ বা ডুবন্ত দ্বীপের শ্যাওলা-মাখানো পাথর আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চিৎকার করত 'বাঁচাও, বাঁচাও', কিন্তু কে বাঁচায় কাকে, কোথায় আলো, কোথায় তীর! ক্রমে ক্রমে তাদের হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসতো, একে একে জলের তলে লীন হয়ে যেত।

দাদী যে ভাবে বর্ণনা দিয়ে যেতেন, তাতে আমি সব-কিছু ভুলে দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে উঠতুম, দাদী বাঁচলেন না, দাদীও ডুবে গেলেন। মনেই হত না, জলজ্যান্ত দাদী আমাকে কোলে বসিয়ে গল্প বলছেন। শেষটায় বলতেন, 'আমাদের জাহাজের কিছু হয়নি, এ সব ঘটেছিল অন্য জাহাজে। সে জাহাজে করে গিয়েছিলেন তোর বন্ধু ময়না মিয়ার ঠাকুর্দা। জানিস তো, তিনি আর ফেরেননি। খুদা তালা তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে গিয়েছেন। মক্কার হজের পথে কেউ যদি মারা যায় তবে তার আর পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না, সে সোজা স্বর্গে চলে যায়।'

দাদী এ রকম গল্প বলে যেতেন অনেকক্ষণ ধরে আর একই গল্প বলতে পারতেন বহু বার। প্রতি বারেই মনে হত চেনা গল্প অচেনারূপে দেখছি। কিম্বা বলতে পারো, দাদী-বাড়ির রাঙা বৌদিকে যেন কখনো দেখছি রাস-মণ্ডল শাড়িতে, কখনো বুলবুল-চশ্‌মে। (হায়, এ সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আজ গেল কোথায়!)

দাদীর গল্পের কথা আজ যখন ভাবি তখন মনে হয় দাদী তার বর্ণনাতে আরব্য উপন্যাসের সাহায্য বেশ কিছু নিতেন। আরব্য উপন্যাসের রকম-বেরকমের গল্পের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রা, জাহাজডুবি, অচেনা দেশ, অজানা দ্বীপ সম্বন্ধে গল্প বিস্তর। সিন্দবাদ নাবিকের

গল্প পড়ে মনে হয়, জলের পীর বদর সাহেব যেন আইন বানিয়ে দিয়েছিলেন, যে জাহাজ ডুববে সেটাতেই যেন সিন্দবাদ থাকে। বেচারী সিন্দবাদ!

আরব্য উপন্যাসে যে এত সমুদ্র-যাত্রার গল্প, তার প্রধান কারণ, আরবরা এক কালে সমুদ্রের রাজা ছিল আজ যে রকম মার্কিন-ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে দেখা যায়। তার কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। আরব দেশের সাড়ে-তিন দিকে সমুদ্র, তাই আরবরা সমুদ্রকে ডরায় না, আমরা যে রকম পদ্মা মেঘনাকে ডরাইনে, যদিও পশ্চিমারা গোয়ালন্দের পদ্মা দেখে হনুমানজীর নাম স্মরণ করতে থাকে—বোধহয় লম্ফ দিয়ে পেরবার জন্য। আরবদের পূর্বে ছিল রোমানরা বাদশা—আরবরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদেরই মত অবাধে অনায়াসে সমুদ্র যাতায়াত আরম্ভ করল। ম্যাপে দেখতে পাবে, মক্কা সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয়। আরবরা তখন লাল দরিয়া মৌসুমী হাওয়ার ভর করে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা জুড়লো।

এ সব কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আবার সোকোত্রার কথা মনে পড়ে গেল। দাদীমার সোকোত্রার স্মরণ করিয়ে দিল গ্রীকদের দেওয়া সোকোত্রার নাম 'দিয়োস্‌করিদেস্‌', সঙ্গে সঙ্গে হুশ হুশ করে মনে পড়ে গেল যে পণ্ডিতেরা বলেন এই 'দিয়োস্‌করিদেস্‌' নাম এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ-সুখাধার' থেকে। আরবরা যখন এই দ্বীপে প্রথম নামলো তখন ভারতীয় বোম্বেটেদের সঙ্গে এদের লাগলো ঝগড়া। সে ঝগড়া কত দিন ধরে চলেছিল বলা শক্ত, কারণ আমাদের সমাজ-পতিরা তখন সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে কড়া কড়া আইন জারী করতে আরম্ভ করেছেন। আমার মনে হয়, এদেশ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে এরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়, কিম্বা ঐ দেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়—যে রকম শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বহু-শতাব্দীর আদান-প্রদানের পর এক দিন আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। খুব সম্ভব ঐ সমুদ্র-

যাত্রা নিষেধ করারই ফলে। ভারতীয়েরা কিন্তু সোকোত্রায় তাদের একটি চিহ্ন রেখে গিয়েছে; সোকোত্রার গাই-গোরু জাতে সিন্ধু দেশের। আশ্চর্য, সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু তার পোষা গোরু-ঘোড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকে তার প্রভুর কথা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-পাঠানের রাজত্ব ভারতবর্ষ থেকে কবে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের আনা গোলাপ ফুল আমাদের বাগানে আরো কত শত বৎসর রাজত্ব করবে কে জানে!

আমি চোখ বন্ধ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেই পল পার্সি আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে অন্য কিছু একটায় লেগে যেত। আমি তাদের সন্ধানে বেরিয়ে দেখি, তারা লাউঞ্জে বসে চিঠি লিখছে। আমাকে দেখে পার্সি শুধালে, 'জাহাজে যে ফরাসী ডাক-টিকিট পাওয়া যায় তাই দিয়ে এ চিঠি চীন দেশে যাবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। এমন কি জিবুটি বন্দরের ডাক-ঘরেও যদি ছাড়ো তবু যাবে। কারণ জিবুটি বন্দর ফরাসীদের। কিন্তু যদি পোর্টসঈদ বন্দরে ছাড়ো তবে সে টিকিট মিশর দেশে বাতিল বলে চিঠিখানা যাবে বেয়ারিং পোস্টে।'

'কিন্তু যদি পোর্টসঈদে পৌঁছে জাহাজের লেটার-বক্সে ছাড়ি?'

'তা হলে ঠিক।'

তারপর বললুম, 'হুঁ। তবে বন্দরে নেমে মিশরী ডাক-টিকিট লাগানোই ভালো।'

'কেন, স্যর?'

আমি বললুম, 'বৎস, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, চীন দেশে তোমার একটি ছোট বোন রয়েছে। সে নিশ্চয়ই ডাক-টিকিট জমায়। তুমি যদি বন্দরে বন্দরে ফরাসী টিকিট সাঁটো তাতে তার কি লাভ? মিশরী টিকিট পেলে কি সে খুশী হবে না? তাও আবার দাদার চিঠিতে!'

পার্সি আবার ভ্যাচর ভ্যাচর আরম্ভ করলে—চুল কাটা সমস্যার সমাধান যখন আমি করে দিয়েছিলুম ঠিক সেই রকম—আমার সঙ্গে দেখা না হলে—

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস। আর শোনো, স্ট্যাম্প লাগাবার সময়, এক পয়সা, দুপয়সা, এক আনা, ছ পয়সা করে করে চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগাবে—দুম্ করে শুদ্ধ একটা চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগিয়ো না। বোন তা হলে এক ধাক্কাতেই অনেকগুলো টিকিট পেয়ে যাবে।'

ততক্ষণে পল এসে আমার সঙ্গ নিয়েছে। আস্তে আস্তে শুধালো, 'সোকোত্রা দ্বীপের কথা ওঠাতে আপনি কি ভাবছিলেন?

আমি বললুম, 'অনেক কিছু।' এবং তার খানিকটে তাকে শুনিয়ে দিলুম।

পল দেখেছি পার্সির মত সমস্ত ক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে মেতে থাকে না। মাঝে মাঝে জাহাজের এক কোণে বসে বই-টই পড়ে। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো হজম করে নিয়ে বললে, 'বিষয়টা সত্যি ভারি ইনট্রেস্‌টিঙ্। সমুদ্রে সব প্রথম কে আধিপত্য করলে, তার পর কে, তারাই বা সেটা হারালো কেন, আজ যে মার্কিন আর ইংরেজ আধিপত্য করছে সেটাই বা আর কত দিন থাকবে? এবং তার পর আধিপত্য পাবে কে?'

আমি একটু ভেবে বললুম, 'বোধ হয়, আফ্রিকার নিগ্রোরা। ফিনিশিয়ান, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়, চীনা, আরব, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি যাবতীয় জাতই তো পালা করে রাজত্ব করলে—একমাত্র ওরাই বাদ গেছে। এখন বোধ হয় ওদের পালা। আর ম্যাপে দেখছ তো, কী বিরাট মহাদেশ, ওতে কোটি কোটি লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান স্ত্রী-পুরুষ গম্‌গম্ করছে।'

পল বললে, 'কিন্তু ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি?'

আমি বললুম, 'সে তো দুই পুরুষের কথা। লেগে গেলে একশ

বছরের ভিতর একটা জাত অন্য সব কটা জাতকে হারিয়ে দিতে পারে। বরঞ্চ পুরনো সভ্য জাত যারা আধ-মরা হয়ে গিয়েছে, তাদের নূতন করে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত করে রাজার আসনে বসানো কঠিন। একবার ছাঁচে ঢালাই করে যে মাল তৈরী করা হয়েছে তাকে ফের পিটে-ঠুকে নূতন আকার দেওয়া কঠিন—সেই তো হচ্ছে আজকের দিনের চীনা, ভারতীয় এবং আরো মেলা প্রাচীন জাতের নূতন সমস্যা।'

পল জিজ্ঞেস করলে, 'ভারতীয়েরাও এক কালে সমুদ্রে রাজত্ব করেছে নাকি?'

আমি বললুম, 'সে-কথা আজ প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত। কারণ, ভারতীয়েরা নিজেই সে ইতিহাসের সন্ধান রাখে না। অথচ আমার যতদূর জানা, তাতে তারা লাল দরিয়া থেকে চীনা সমুদ্র পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াতে রাজত্বও করেছে। তার পর একদিন আমাদের সমাজপতিরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করে দিলেন। খুব সম্ভব আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁরা পছন্দ করেননি। তাই হয়তো তারা বলতে চেয়েছিলেন, যে-দেশ জয় করেছো তারই আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যাও, আপন দেশে ফিরে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।'

পল বললে, 'আমার জীবনের এই ষোল বৎসর কাটলো চীনে কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের কখনো কোনো যোগ হয়েছিল বলে শুনিনি। শুধু শুনেছি বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে এসেছিল। কিন্তু সে তো কটমটে ব্যাপার!'

আমি বললুম, 'অতিশয়। ও পাড়া মাড়িয়ো না। কিন্তু চীন ভারতের মধ্যে এক বার একটি ভারি চমৎকার মজাদার দোস্তি হয়েছিল। শুনবে?'

পল বললে, 'তা আর বলতে। কিন্তু পার্সিটা গেল কোথায়?

কুকুর-ছানার মত ও যেন সমস্ত ক্ষণ নিজের ল্যাজ খুঁজে বেড়ায়। ওরে, ও পার্সি!'

জিরাফ্-কাহিনী

দিল্লীতে যখন পাঠান-মোগল রাজত্ব করতো তখন সামান্যতম সুযোগ পেলেই বাঙলা দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। বাঙলার প্রধান সুবিধে এই যে, সেখানে নদী-নালা বিল-হাওর বিস্তর এবং পাঠান-মোগলের আপন পিতৃভূমি কিম্বা দিল্লীতে ও-সব জিনিস নেই বলেই তারা যখনই বিদ্রোহ দমন করতে এসে বাঙলার জল দেখত তখনই তাদের মুখে জল যেত শুকিয়ে।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে বাঙলার এক শাসন-কর্তা স্বাধীন হয়ে রাজা হয়ে যান। রাজাটি একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা না হলে কোথায় ইরান আর কোথায় বাঙলা দেশ! তিনি সেখানে দূত পাঠালেন বিস্তর দামী দামী সওগাত সঙ্গে দিয়ে ইরানের সবচেয়ে সেরা কবি হাফিজকে বাংলা দেশে নিমন্ত্রণ করার জন্য! চিঠিতে লিখলেন, 'হে কবি, তোমার সুমধুর অথচ উদাত্ত কণ্ঠে তামাম ইরান দেশ ভরে গিয়েছে। ইরান ক্ষুদ্র দেশ, তোমার কণ্ঠস্ফূর্তির জন্য সেখানে আর স্থান নেই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এখানে এস, তোমার কণ্ঠস্বর এখানে প্রচুর জায়গা পাবে।' তার সরল অর্থ, ইরানে আর কটা লোক তোমার সত্যকার কদর করতে পারবে? এ-দেশের লোকসংখ্যা প্রচুর। এইখানে চলে এস।

হাফিজের তখন বয়স হয়েছে। তাঁর বুড়ো হাড়-কখানা তখন আর দীর্ঘ ভ্রমণ আর দীর্ঘতর প্রবাসের জন্য দেশ ছাড়তে নারাজ। তাই কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখে না আসতে পারার জন্য বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বাঙলা দেশের সরকারি দলিল-দস্তাবেজে এ ঘটনার কোনো

উল্লেখ নাই। এর ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে ইরানের খাতাপত্র থেকে।[১]

তার পর রাজার দৃষ্টি গেল সেই সুদূর চীন দেশের দিকে। কিন্তু চীন-সম্রাটকে তো আর বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করা যায় না? কাজেই রাজদূতকে বহু উত্তম উত্তম উপঢৌকন দিয়ে চীনের সম্রাটকে বাঙলার রাজার আনন্দ-অভিবাদন জানালেন।

চীন-সম্রাট সুদূর বাঙলা দেশের রাজার সৌজন্য ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে পরম আপ্যায়িত হলেন। চীন বিত্তশালী দেশ। প্রতিদানে পাঠালেন আরো বেশী মূল্যবান উপঢৌকন।

বাঙলার রাজা তখন ভাবলেন, চীনের সম্রাটকে আমি কি দিতে পারি যা তাঁর নেই। রাজদূতকে মনের কথা খুলে তাঁর উপদেশ চাইলেন। রাজদূতটি ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি যখন চীনে ছিলেন তখন চীন দেশের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস-অবিশ্বাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন। বললেন, 'চীনের বহু লোকের বিশ্বাস, গাছের চেয়ে উঁচু মাথাওলা যে এক পয়মন্ত প্রাণী আছে সে যদি কখনো চীন দেশে আসে তবে সে দেশের শস্য তার-ই মাথার মত উঁচু হবে।'

রাজা শুধালে, 'কি সে প্রাণী?'

রাজদূত বললেন, 'জিরাফ। আফ্রিকাতে পাওয়া যায়।'

রাজা বললেন, 'আনাও আফ্রিকা থেকে।'

যেন চাট্টিখানি কথা! কোথায় বাঙলা দেশ, আর কোথায় আফ্রিকা! আজ যে এই বিরাট বিরাট কলের জাহাজ দুনিয়ার সর্বত্র আনাগোনা করে তার-ই একটাতে জিরাফ পোরা কি সহজ!

---

(১) এক কালে বাঙলা দেশে প্রচুর হাফিজ পড়া হত। এখনও কেউ কেউ 'নেত্র নাই বাছা হেরিব বিধুর বদন, কর্ণ নাই, চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন' 'সদ্ভাব শতক'-এর বাঙলা অনুবাদে পড়েন। হাফিজের সবচেয়ে উত্তম বাঙলা অনুবাদ করেছেন ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

তখনকার দিনের পালের জাহাজে আফ্রিকা থেকে বাঙলা দেশ, সেখান থেকে আবার চীন—ক'মাস, কিম্বা ক'বছর লাগবে কে জানে? তত-দিন তার জন্য ঐ অকূল দরিয়ায় ঘাস-পাতা পাবে কোথায়—দেখতে পাচ্ছি এই কলের জাহাজেই আমাদের শাক-সব্‌জী স্যালাড্‌ খেতে দেয় অল্প—তার অন্যান্য তদারকি কি সহজ?

তখনকার দিনে আরব কারবারীরা আফ্রিকা, সোকোত্রা, সিংহল হয়ে বাঙলা দেশে ব্যবসা করতে যেত। রাজা হুকুম দিলেন, 'জিরাফ নিয়ে এস।'

জিরাফ এল। কি খেয়ে এল, কত দিনে এল, কিছুই বলতে পারব না। রাজা জিরাফ দেখে ভারি খুশী। হুকুম দিলেন, 'চীন-সম্রাটকে ভেট দিয়ে এস।'

সেই চীন! জাহাজে করে! কত দিন লাগলো কে জানে!

চীন-সম্রাট সংবাদ পেয়ে যে কতখানি খুশী হয়েছিলেন তার খানিকটে কল্পনা করা যায়। তিনি হুকুম দিলেন, প্রাণীটার জন্য খুব উঁচু করে আস্তাবল বানাও।

বলা তো যায় না, তার মুণ্ডুটা মেঘে ঠেকবে, না চাঁদে ঠোক্কর লাগাবে!

দীর্ঘ ভ্রমণের পর জিরাফ যখন জিরিয়ে-জুরিয়ে তৈরী তখন শুভদিন শুভক্ষণ দেখে, চীন-সম্রাট পাত্র অমাত্য সভাসদ সহ শোভাযাত্রা করে জিরাফ দর্শনে বেরলেন। সঙ্গে নিলেন, বিশেষ করে, রাজচিত্রকর এবং সভাকবি।

সম্রাট জিরাফ দেখে গভীর আনন্দ লাভ করলেন। সভাসদ ধন্য ধন্য করলেন। আপামর জনসাধারণ গভীরতর সন্তোষ লাভ করলো,—তাদের গুরুজন বলেছিলেন যে এ রকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, এবং সে এক দিন চীন দেশে আসবে, সেটা কিছু অন্যায় বলেননি। যারা সন্দেহ করতো তাদের মুণ্ডুগুলো এখন টেনে টেনে ঐ জিরাফের মুণ্ডুটার মত উঁচু করে দেওয়া উচিত।

সম্রাট চিত্রকরকে আদেশ দিলেন, 'এই শুভদিবস চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তুমি এই জিরাফের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করো।'

ছবি আঁকা হল।

সম্রাট কবিকে আদেশ করলেন, 'তুমি এই শুভ অনুষ্ঠানের বর্ণনা ছন্দে বেঁধে ছবিতে লিখে রাখো।'

তাই করা হল।

গল্প শেষ করে বললুম, 'সে ছবির প্রিণ্ট আমি কাগজে দেখেছি।'

পল শুধালে, 'স্যর, আপনি কি চীনা ভাষা পড়তে পারেন?'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমার এক বন্ধু চীনা শিখেছে সে-ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ার জন্য। জানো তো, আমাদের বহু শাস্ত্র এ দেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু চীনা অনুবাদে এখন বেঁচে আছে। আমার বন্ধু বৌদ্ধ শাস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে এই অদ্ভুত কাহিনীর সাক্ষাৎ পায়। তারই বাঙলা অনুবাদ করে, ছবিশুদ্ধ সেটা বাঙলা কাগজে ছাপায়। তা না হলে বাঙলা দেশের লোক কখনো এ কাহিনী জানতে পারতো না, কারণ বাঙলা দেশে এ-সম্বন্ধে কোনো ইতিহাস বা দলিল-পত্র নেই।'

পার্সি বললে, 'কিন্তু স্যর, এটা তো ইতিহাসের মত শোনালো না! এ যে গল্পকে ছাড়িয়ে যায়।'

আমি বললুম, 'কেন বৎস, তোমার মাতৃভাষাতেই তো রয়েছে, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার ছান্ ফিক্‌শন্'—'সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ।'

এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে-ঘটনার বর্ণনা মানুষকে গল্পের চেয়েও বেশী সজাগ করে না তুলতে পারে, সে ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিম্বা বলবো, যে লোক ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে সে সত্যকার ঐতিহাসিক নয়। আমার দেশে এ রকম কাঠখোট্টা ঐতিহাসিকই বেশী!

কলরব, চিৎকার তারস্বরে আর্তনাদ। কি হল, কি হয়েছে? তবে কি জাহাজে বোম্বেটে পড়েছে? বায়স্কোপে যে রকম দেখি, বোম্বেটেরা দুহাতে দুই পিস্তল, দুপাটি দাঁতে ছোরা কামড়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ আক্রমণ করে? তার পর হঠাৎ কানের পর্দা ফাটিয়ে এক ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ—বারুদ-গোদামে আগুন লেগে সেটা ফেটে গিয়েছে। তারই আগুন জাহাজের দড়া-দড়ি পাল-মাস্তুলে লেগে গিয়ে সমস্ত জাহাজ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নাঃ! স্বপ্ন। বাঁচলুম। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। চোখ মেলতে দেখি, কেবিনের সব কটা আলো জ্বলছে আর সামনে দাঁড়িয়ে পল আর পার্সি। পল দাঁড়িয়ে আছে সত্যি কিন্তু পার্সিটা জুলু না হটেনটট্ কি যেন এক বিকট আফ্রিকান নৃত্য জুড়েছে—আফ্রিকান-ই হবে, কারণ ঐ মহাদেশেরই গা ঘেঁষে তো এখন আমরা যাচ্ছি।

তা আফ্রিকার হটেনটটীয় মার্তণ্ড-তাণ্ডব নৃত্যই হোক আর ইয়োরোপীয় মাৎস্নুর্কা কিম্বা ল্যামবেথ-উয়োক্-ই হোক—আমি অবশ্য এ দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখতে পাইনে, সঙ্গীতে তো আদৌ না—পার্সি এ সময়ে আমার কেবিনে এসে বিন্-নোটিশে নাচ জুড়বে কেন?

নাঃ, নাচ নয়। বেচারী উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করছে আর যে কাতর রোদন জানাচ্ছে সেটার 'সামারি' করলে দাঁড়ায় ;—

'হায়, হায়, সব কিছু সাড়ে-সর্বনাশ হয়ে গেল, স্যর! আপনি এখনো অকাতরে নাক ডাকাচ্ছেন। আমার জীবন বিফল হল,

পলের জীবনও বৃথায় গেল। জাহাজ রাতারাতি ডুবসাঁতার কেটে জিবুটি বন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। সবাই জামা-কাপড় পরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে পারে নামবার জন্য তৈরী, আর আপনি,—হায়, হায়!'

(এ বইখানার যদি ফিল্‌ম্ হয় তবে এ স্থলে 'অশ্রুবর্ষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস')

আমি চোখ বন্ধ করলুম দেখে পার্সি এবারে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

আমি শান্ত কণ্ঠে শুধালুম, 'জাহাজ যদি জিবুটি পৌঁছে গিয়ে থাকে তবে এখনো এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পারছি কেন?'

পার্সি অসহিষ্ণুতা চাপবার চেষ্টা করে বললে, 'এঞ্জিন বন্ধ করা, না-করা তো এক মিনিটের ব্যাপার।'

আমি বললুম, 'নৌ-ভ্রমণে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বলে, এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পরও জাহাজ থেকে নামতে নামতে ঘণ্টা দুয়েক কেটে যায়।'

পল এই প্রথম মুখ খুললে; বললে, 'বন্দর যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'দার্জিলিঙ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োটা স্পষ্ট দেখা যায়, তাই বলে কি সেখানে দশ মিনিটে পৌঁছনো যায়?'

তার পর বললুম, 'কিন্তু এ সব কুতর্ক। আমি হাতে-নাতে আমার বক্তব্য প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

তার পর অতি ধীরে-সুস্থে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলুম। পল আমার কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছে কিন্তু পার্সি তখনো ব্যস্ত-সমস্ত। আমাকে তাড়া লাগাতে গিয়ে দাড়ি কামানোর বুরুশটা এগিয়ে দিতে গিয়ে তুলে ধরে দাঁতের বুরুশ—ঐটে দিয়ে গাল ঘসলে মুখপোড়া হনুমান হতে কতক্ষণ—টাই ভেবে সামনে ধরে ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধটা। তার পর চা-রুটি, মাখম-আণ্ডাতে অপূর্ব এক ঘ্যাঁট বানিয়ে আমার সামনে ধরে চতুর্দিকে ঘোরপাক খেতে লাগল—

বাড়িতে জিনিসপত্র বাঁধাই-ছাঁদাই করার সময় প্যাপিটা যে রকম এর পা ওর পার ভিতর দিয়ে ঘোরপাক খায় এবং বাড়িশুদ্ধ লোককে চটিয়ে তোলে।

শেষটায় বেগতিক দেখে আমিও একটু তাড়াহুড়ো করে সদলবলে ডেকে এলুম।

উপরে তখন আর সবাই অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে তাস পাশা, গালগল্পে ফিরে গিয়েছে।

পল চোখে দূরবীন লাগিয়ে বললে, 'কই, স্যর, বন্দর কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ধূ-ধূ করছে মরুভূমি আর টিনের বাক্সের মত কয়েক সার একঘেয়ে বাড়ি।'

আমি বললুম, 'এর-ই নাম জিবুটি বন্দর।'

'ঐ মরুভূমিতে দেখবার মত আছে কি?'

'কিচ্ছু না। তবে কি জানো, ভিন্‌দেশ পরদেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অত-শত বাছ বিচার করতে নেই—বিশেষতঃ এই অল্প বয়সে। চিড়িয়াখানায় যখন ঢুকেছ, তখন বাঘ-সিংগি দেখার সঙ্গে সঙ্গে খাটাশটাও দেখে নেওয়াই ভালো। আর কে জানে, কোন্ মোড় ঘুরতে কোন্ এক অপ্রত্যাশিত জিনিস বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না? মোকামে পৌঁছনোর পর না হয় জমা-খরচ করা যাবে, কোন্‌টা ভালো লাগলো আর কোন্‌টা লাগল না।'

জাহাজ থেকে তড়-তড় করে সিঁড়ি ভেঙে ডাঙায় নামা যায় পৃথিবীর ভালো ভালো বন্দরেই। এখানে তাই পারে যেতে হল মোটর লঞ্চ করে। জিবুটির চেয়েও নিকৃষ্ট বন্দর পৃথিবীতে হয়তো আছে কিন্তু আমার দেখার মধ্যে ঐটেই সবচেয়ে অপ্রিয়দর্শন ও বৈচিত্র্যহীন বন্দর। মরুভূমির প্রত্যন্ত-ভূমিতে বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে একমাত্র রাজ্যবিস্তারের লোভে। এবং এ মরুভূমিকে কোনো প্রকারের শ্যামলিমা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জেনেই কেউ কোনো দিন কণামাত্র চেষ্টা করেনি একে একটুখানি আরামদায়ক করার।

ডাঙা থেকে সোজা চলে গিয়েছে একটা ধুলোয় ভর্তি রাস্তা বন্দরের চৌক বা ঠিক মাঝখানে। তার পর সেখান থেকে এদিকে ওদিকে দু-চারটে রাস্তা গিয়েছে বটে কিন্তু বড় রাস্তাটা দেখার পর ও-সব গলিতে ঢোকার প্রবৃত্তি সুস্থলোকের হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তার দুদিকে সাদা চুনকাম-করা বাড়িগুলো এমনি মুখ গুমসো করে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাড়ির বাসিন্দারাও বোধ করি এ-সব বাড়িতে ঢোকার সময় দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুকনো ঢোক গেলে কিম্বা বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকে নেয়। ছোট গলির মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি, মাটির তৈরী দেয়াল-ছাদের ছোট ছোট ঘর, না, ঘর নয়, গহ্বর কিম্বা গুহাও বলতে পারো। বৃষ্টি এদেশে এতই ছিটেফোঁটা হয় যে, ছাত গলে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর থাকলেই বা কি, এদেশে তো আর ঘাস-পাতা গজায় না যে তাই দিয়ে চাল বানাবে?

এর-ই ভিতরে মানুষ থাকে, মা ছেলেকে ভালোবাসে, ভাই ভাইকে স্নেহ করে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই হয়!

কিন্তু আমি এত আশ্চর্য হচ্ছি কেন? আমি কি কখনো গলির ঘিঞ্জি বস্তির ভিতর ঢুকিনি—কলকাতায়? সেখানে দেখিনি কী দৈন্য, কী দুর্দশা! তবে আজ এখানে আশ্চর্য হচ্ছি কেন? বোধ হয় বিদেশে এ জিনিস প্রত্যাশা করিনি বলে, কিম্বা দেশের দৈন্য দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বলে বিদেশে তার অন্য রূপ দেখে চমকে উঠলুম।

এইখানেই মহামানব এবং হীনপ্রাণে পার্থক্য! মহাপুরুষরা দৈন্য দেখে কখনো অভ্যস্ত হন না। কখনো বলেন না, এ তো সর্বত্রই হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। দৈন্য তাঁদের সব সময়ই গভীর পীড়া দেয়—যদিও আমরা অনেক সময় তাঁদের চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারিনে। তার পর একদিন তাঁরা সুযোগ পান, যে সুযোগের প্রতীক্ষায় তাঁরা বছরের পর বছর প্রহর

শুনছিলেন, কিম্বা যে সুযোগ তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আপন হাতে গড়ে তুলছিলেন, এবং এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী, গিরিদরী-তলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি পরিপূর্ণ বলে
সেই মত বাহিরিলে; বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা॥"

তাই যখন হঠাৎ একদিন এক অরবিন্দ ঘোষ, এক চিত্তরঞ্জন দাশ এসে আমাদের মাঝখানে দেখা দেন তখন আমাদের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আজন্ম, আশৈশব, অনটনমুক্ত বিলাসে জীবন যাপন করে হঠাৎ একদিন তাঁরা সবকিছু বিসর্জন করে গিয়ে দাঁড়ান গরীব দুঃখী, আতুর অভাজনের মাঝখানে। যে দৈন্য দেখে ভিতরে ভিতরে গভীর বেদনা পেতেন, সে দৈন্য ঘুচাতে গিয়ে তাঁরা তখন পান গভীরতর বেদনা। কিন্তু সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই হবে।

"—তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো। জয় তব জয়।"

কিন্তু এত সব কথা তোমাদের শোনাচ্ছি কেন? তার কারণ গত রাত্রে জাহাজে বসে বসে আফ্রিকা মহাদেশ এবং বিশেষ করে যে সোমালি দেশের ভিতর জিবুটি বন্দর অবস্থিত তারই কথা ভাবছিলুম বলে। এবং এই সোমালিদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচাবার জন্য যে একটি লোক বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল তার কথা বার বার মনে পড়ছিল বলে।

ইয়োরোপীয় বর্বরতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখতে হলে পড়তে হয়

আফ্রিকার ইতিহাস—ইংরেজ-শাসিত ভারতের ইতিহাস তার তুলনায় নগণ্য।

পোর্তুগীজ, ইংরেজ, জর্মন, ফরাসী, বেলজিয়াম—কত বলবো—ইয়োরোপীয় বহু জাত, কম-জাত, বজ্জাৎ এই আফ্রিকায় একদিন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের বর্বর পাশবিক ক্ষুধা নিয়ে, শকুনের পাল যে রকম মরা গোরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুল বললুম; শকুনিদের উপর অবিচার করা হল, কারণ তারা তো জ্যান্ত: পশুর উপর কখনো ঝাঁপ দেয় না। এই ইয়োরোপীয়রা এসে ছেঁকে ধরলো সোমালি, নীগ্রো, বান্টু, হটেনটটদের। তাদের হাতে-পায়ে বেঁধে মুর্গী-লাদাই ঝাঁকার মত জাহাজ-ভর্তি করে নিয়ে গেল আমেরিকায়। কত লক্ষ নীগ্রো দাস যে তখন অসহ্য যন্ত্রণায় মারা গেল তার নিদারুণ করুণ বর্ণনা পাবে 'আন্‌ক্‌ল্‌ টম্‌স্‌ ক্যাবিন' পুস্তকে—বইখানা পড়ে দেখো। ইংরিজি ভালো বুঝতে না পারলে বাঙলা অনুবাদ 'টম্‌ কাকার কুটির' পড়লেই হবে—আমি ছেলেবেলায় বাঙলাতেই পড়েছিলুম।

আর আফ্রিকার ভিতরে যা করলে তার ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ কঙ্গো সম্বন্ধে একখানা বই লিখে এমনই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন যে তাঁর মত দুঃসাহসী না হলে ঐ সম্বন্ধে কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায় না। আর লিখলেই বা কি, প্রকাশক পাবে না। প্রকাশক পেলেই বা কি? কাগজে কাগজে বেরুবে তার বিরুদ্ধে রূঢ় মন্তব্য, অশ্লীল সমালোচনা। তখন আর কোনো পুস্তক-বিক্রেতা তোমার বই তার দোকানে রাখবে না। তবু জেনে রাখা ভালো, এমন মহাজনও আছেন যাঁরা এ সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বই লেখেন, ছাপান, প্রকাশ করেন এবং লোকে সে সব পড়ে বলে দেশে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্ট হয়।

সোমালি দেশের উপর রাজত্ব করতে এসেছিল বিস্তর

জাত : তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল ফরাসী, ইংরেজ ও ইতালীয়।

ব্রিটিশ-সোমালি দেশে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুহম্মদ বিন আব্দুল্লা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। নিরস্ত্র কিম্বা ভাঙাচোরা বন্দুক আর তীর-ধনুকে সজ্জিত সোমালিরা তাঁর চতুর্দিকে এসে জড়ো হল অসীম সাহস নিয়ে—ইয়োরোপীয় কামান মেশিন গানের বিপক্ষে। এদিকে ইতালীয় এবং ব্রিটিশে সোমালি দেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মারামারি, ওদিকে কিন্তু দুই দলই এক হয়ে গেলেন মোল্লা মুহম্মদের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য।

দুই পক্ষেরই বিস্তর হার-জিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোল্লাই ইয়োরোপীয়দের খেদিয়ে খেদিয়ে লাল-দরিয়ার পার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। ইংরেজ তখন সোমালিদের উপর রাজত্ব করার আশা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রপারে দুর্গ বানিয়ে তার-ই ভিতর বসে রইল লাল-দরিয়ার বন্দরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

সারা সোমালি দেশে জয়ধ্বনি জেগে উঠল—সোমালি স্বাধীন! তখন ইংরেজ তাঁকে নাম দিল, 'ম্যাড্ মোল্লা' অর্থাৎ 'পাগলা মোল্লা', আমাদের গাঁধীকে যে রকম একদিন নাম দিয়েছিল, 'নেকেড্ ফকীর' অর্থাৎ 'উলঙ্গ ফকীর'। হেরে যাওয়ার পর মুখ ভ্যাংচানো ছাড়া করবার কি থাকে, বলো?

কিন্তু হায়, খুব বেশী বৎসর গেল না। ১৯১৪-১৮র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপীয়রা অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা মেরে মানুষকে কাবু করার কৌশল শিখে গিয়েছে। তাই দিয়ে যখন আবার তারা হানা দিলে তখন মোল্লাকে সে সময়কার মত পরাজয় স্বীকার করে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল ভিন্ দেশে।

মোল্লা সেই অনাদৃত অবহেলায় আবার সাধনা করতে লাগলেন স্বাধীনতা জয়ের নূতন সন্ধানে। কিন্তু হায়, দীর্ঘ বাইশ বৎসরের কঠিন যুদ্ধ, নিদারুণ কৃচ্ছ সাধনে তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভেঙে গিয়েছে।

শেষ পরাজয়ের এক বৎসর পর, যে-ভগবানের নাম স্মরণ করে বাইশ বৎসর পূর্বে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমেছিলেন তাঁরই নাম স্মরণ করে সেই লোকে চলে গেলেন যেখানে খুব সম্ভব সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব নেই।

এই যে জিবুটি বন্দরে বসে বসে চোখের সামনে তাগড়া লম্বা জোয়ান সোমালিদের দেখছি, তারাও নাকি তখন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল।

বীরের কাহিনী থেকে আমরা উৎসাহ সঞ্চয় করবো, তা না হলে আমি এ দুঃখের কাহিনী তুললুম কেন? তার কারণ বুঝিয়ে বলার পূর্বে একটি কথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই।

'ফরাসীরা বড় খারাপ', 'ইংরেজ চোরের জাত' এ রকম কথার কোনো অর্থ হয় না। ভারতবর্ষে বিস্তর পকেট-মার আছে, তাই বলে কেউ যদি গাল দেয় 'ভারতবাসীরা পকেট-মার' তা হলে অধর্মের কথা হয়। 'ইংরেজ জাত অত্যাচারী' এ-কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

তাই যখন অধর্ম অরাজকতা দেখি, তখন সংযম বর্জন করে তদ্দণ্ডেই অস্ত্রধারণ করা অনুচিত। বহু জাত বহু বার করে দেখেছে, কোনো ফল হয়নি; হিংসা আর রক্তপাত শুধু বেড়েই গিয়েছে।

তাই মহাত্মাজী অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। অহিংসা দিয়ে হিংসা জয় করতে হবে। এর চেয়ে মহৎ শিক্ষা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষ যদি তাই দিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সংগ্রাম, লুণ্ঠন-শোষণ রুদ্ধ করতে পারে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সে সর্বসভ্য জাতি বলে গণ্য হবে।

এবং শেষ কথা—সবচেয়ে বড় কথা;—

আমাদের যেন রাজ্যলোভ না হয়। এদের অন্যায় আচরণ দেখে আমরা যেন সতর্ক হই। আমরা দুশ বৎসর ধরে পরাধীন ছিলুম। পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি।

পল জিজ্ঞেস করলে, 'এক দৃষ্টে কি দেখছেন, স্যর? আমি তো তেমন কিছু নয়নাভিরাম দেখতে পারছিনে।'

বললুম, 'আমি কিঞ্চিৎ শার্লক হোম্‌স্‌গিরি করছি। ঐ যে লোকটা যাচ্ছে দেখতে পারছো? সে ঐ পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এল তো? দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা 'ফ্রিজোর'; তাই লোকটার ঘাড়ের দিকটা দেখে অনুমান করছিলুম, জিবুটি বন্দরের নাপিতদের কোন্ পর্যায়ে ফেলি?'

পার্সি বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার ঠিক মনে আছে। আমি তো চুল কাটাবার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। চলুন ঢুকে পড়ি।'

আমি বললুম, 'তা পারো। তবে কি না, মনে হচ্ছে, এ-দেশে কোদাল দিয়ে চুল কাটে।'

পার্সি বললে, 'কোদাল দিয়েই কাটুক, আর কাস্তে দিয়েই কামাক, আমার তো গত্যন্তর নেই।'

নাপিত ভায়া ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। আমি তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলুম, পার্সির প্রয়োজনটা কি।

কিন্তু দোকানটা এতই ছোট যে, পল আর আমি সেখানে বসবার জায়গা পেলুম না। বারান্দাও নেই। পার্সিকে বললুম, তার চুল কাটা শেষ হলেই সে যেন বন্দরের চৌমাথার কাফেতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

চৌমাথায় একটি মাত্র কাফে। সব কটা দরজা খোলা বলে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, খদ্দের গিস-গিস করছে। কিন্তু এইটুকু হাতের-

তেলো-পরিমাণ বন্দর, এখানে মেলার গোরুর হাট বসলো কি করে ?

ভিতরে গিয়ে দেখি, এ কি, এ যে আমাদের জাহাজেরই ডাইনিঙ রূম! খদ্দেরের সব কজনাই আমাদের অতিশয় সুপরিচিত সহযাত্রীর দল। এ বন্দর 'দেখা' দশ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বলে, সবাই এসে জড়ো হয়েছেন ঐ একটি মাত্র কাফেতেই। তাই কাফে গুলজার। এবং সবাই বসেছেন আপন আপন টেবিল নিয়ে। অর্থাৎ জাহাজের ডাইনিঙ রূমে যে চার জন কিম্বা ছজন বসেন এক টেবিল নিয়ে, ঠিক সেই রকম এখানেও বসেছেন আপন আপন গুষ্ঠি নিয়ে।

এক কোণে বসেছে গুটিকয়েক লোক, উদাস নয়নে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে। জাহাজে এদের কখনো দেখি নি। আন্দাজ করলুম, এরাই তবে জিবুটির বাসিন্দা। জরাজীর্ণ বেশভূষা।

কিন্তু এ সব পরের কথা। কাফেতে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে এ দেশের মাছি। 'চোখে পড়ে' বাক্যটি শব্দার্থেই বললুম, কারণ কাফেতে ঢোকার পূর্বেই এক ঝাঁক মাছি আমার চোখে থাবড়া মেরে গেল।

কাফের টেবিলের উপর মাছি বসেছে আয়না কেটে, 'বারের' কাউণ্টারে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, খদ্দেরের পিঠে, হ্যাটে,—হেন স্থান নেই যেখানে মাছি বসতে ভয় পেয়েছে।

দু-গেলাস 'নিম্বু-পানি' টেবিলে আসা মাত্রই তার উপরে, চুমুক দেবার জায়গায়, বসলো গোটা আষ্টেক মাছি। পল হাত দিয়ে তাড়া দিতেই গোটা কয়েক পড়ে গেল শরবতের ভিতর। পল বললে, 'ঐ য্ যা।'

আমি বললুম, 'আরেকটা অর্ডার দি ?'

সবিনয়ে বললে, 'না, স্যর ; আমার এমনিতেই ঘিন-ঘিন করছে। আর পয়সা খরচা করে দরকার নেই।'

তখন তাকিয়ে দেখি, অধিকাংশ খদ্দেরের গেলাসই পুরো ভর্তি।

ততক্ষণে ওয়েটার দুটি চামর দিয়ে গেছে। আমরাও চামর দুটি হাতে নিয়ে অন্য সব খদ্দেরদের সঙ্গে কোরাসে মাছি তাড়াতে শুরু করলুম।

সে এক অপরূপ দৃশ্য! জন পঞ্চাশেক খদ্দের যেন এক অদৃশ্য রাজাধিরাজের চতুর্দিকে জীবন-মরণ পণ করে চামর দোলাচ্ছে। ডাইনে চামর, বাঁয়ে চামর, মাথার উপরে চামর, টেবিলের তলায় চামর। আর তার-ই তাড়ায় মাছিগুলো যূথভ্রষ্ট কিম্বা ছন্নছাড়া হয়ে কখনো ঢোকে পলের নাকে, কখনো ঢোকে আমার মুখে। কথা-বার্তা পর্যন্ত প্রায় বন্ধ। শুধু চামরের সাঁই-সাঁই আর মাছির ভন্‌-ভন্‌! রুশ-জর্মনে লড়াই!

মাত্র সেই চারটি খাস জিবুটি বাসিন্দে নিশ্চল নীরব। অনুমান করলুম, মাছি তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এবং মাছিদের সঙ্গে লড়নেওলা জাহাজ-যাত্রীর দলও তাদের গা-সওয়া। এরকম লড়াইও তারা নিত্যি নিত্যি দেখে।

তখন লক্ষ্য করলুম তাদের শরবত পানের প্রক্রিয়াটা। তারা চামর তো দোলায়ই না, হাত দিয়েও গেলাসের মুখ থেকে মাছি খেদায় না। গেলাস মুখে দেবার পূর্বে সেটাতে একটু মোলায়েম ঠোনা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মাছিগুলো ইঞ্চি তিনেক উপরে ওঠা মাত্রই গেলাসটি টুক করে টেনে এনে চুমুক লাগায়। ঘিনপিত এদের নেই।

পলও লক্ষ্য করে আমাকে কানে কানে শুধোলে, 'এ লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় এ-সব লোক থাকে কেন?'

আমি বললুম, 'সে বড় দীর্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ এদের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞেস করো তবে শুনবে, প্রত্যেকের জীবনের দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় কাহিনী।'

এ সংসারের সর্বত্রই এক রকম লোক আছে যারা রাতারাতি লক্ষপতি হতে চায়। খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নোকরি

কোনো কাজেই ওদের মন যায় না। অত খাটে কে, অত লড়ে কে ?—এই তাদের ভাবখানা।

সিনেমায় নিশ্চয় দেখেছ, হঠাৎ খবর রটলো আফ্রিকার কোথায় যেন সোনা পাওয়া গিয়েছে ; সেখানে মাটির উপর-নিচে সর্বত্র তাল তাল সোনা পড়ে আছে আর অমনি চললো দলে দলে দুনিয়ার লোক—সেই সোনা যোগাড় করে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য। সিনেমা কত রঙ-চঙেই না সে দৃশ্য দেখায়! অনাহারে তৃষ্ণায় পড়ে আছে, এখানে মড়া সেখানে মড়া। কোনো কোনো জায়গায় বাপ-মা, বেটা-বেটী চলেছে এক ভাঙা গাড়িতে করে—ছেলেটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, মেয়েটা ভিরমি গেছে। বাপ টিনের ক্যানাস্তরা হাতে করে ধুঁকতে ধুঁকতে জল খুঁজতে গিয়ে এ পাথরে টক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ও পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জখম হচ্ছে। মায়ের চোখে জলের কণা পর্যন্ত নেই—যেন অসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, এরা এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া উপায় নেই। থামলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, এগুলে বাঁচলে বাঁচতেও পারো।

কজন পৌঁছয়, কজন সোনা পায়, তার ভিতর কজন জনসমাজে ফিরে এসে সে ধন ভোগ করতে পারে, তার কোনো সরকারী কিংবা বে-সরকারী সেনসাস্ কখনো হয় নি। আর হলেই বা কি ? যাদের এ ধরনের নেশা জন্মগত তাদের ঠেকাবে কোন্ আদমশুমারী ?

কিংবা হয়তো এদেরই একজন লেগে গেল কোম্পানি বানিয়ে, শেয়ার বিক্রি করে টাকা তুলতে। কেন ? কোন্ এক বোম্বেটে কাপ্তান কোন্ এক অজানা দ্বীপে কোটি কোটি টাকার ধন নিয়ে উধাও হয়ে যায়। সেই দ্বীপ খুঁজে বের করতে হবে, সেই ধন উদ্ধার করে রাতারাতি বড়লোক হতে হবে। যে সমুদ্রে ঐ দ্বীপটার থাকার কথা সেখানে যাত্রী-জাহাজ বা মাল-জাহাজ কিছুই যায় না। সে দ্বীপে নাকি খাবার জল পর্যন্ত নেই। ঐ বোম্বেটে কাপ্তান নাকি জলতৃষ্ণায় মারা গিয়েছিল। আরো কত রকম উড়ো খবর।

যে কোম্পানি খুললে, সে বলে বেড়াচ্ছে তার কাছে ম্যাপ রয়েছে ঐ দ্বীপে যাবার জন্য। সাধারণ লোক বলে, 'কই, ম্যাপটা দেখি।' লোকটা বলে, 'আব্দার! তার পর তুমি টাকাটা মেরে দাও আর কি?' কিন্তু রাতারাতি বড় লোক হওয়ার দল অত শত শুধায় না। তারা কোম্পানির শেয়ারও কেনে না—পয়সা থাকলেও কেনে না। তারা গিয়ে কান্নাকাটি লাগায় লোকটার কাছে—'খালাসী করে, বাবুর্চি করে আমাদের নিয়ে চল, তোমার সঙ্গে। তনখা-মাইনে কিছু চাইনে।' কাপ্তেনও ঐ রকম লোকই খুঁজছে,—শক্ত তাগড়া জোয়ান, মরতে যারা ডরায় না।

তারপর একদিন সে জাহাজ রওয়ানা হল। কিন্তু আর ফিরে এল না।

কিংবা ফিরে এল মাত্র কয়েক জন লোক। কিছুই পাওয়া যায় নি বলে এরা তাকে খুন করেছে। তখন লাগে পুলিস তাদের পিছনে। মোকদ্দমা হয়, আরো কত কি?

পল কাফের সেই চারটি জিবুটিবাসীর দিকে তাকিয়ে ফিস-ফিস করে আমাকে শুধালে, 'এরা সব ঐ ধরনের লোক?'

আমি বললুম, 'না, তবে ওদের বংশধর। বংশধর অর্থে ওদের ছেলে নাতি নয়, কারণ ও ধরনের লোক বিয়ে-থা বড় একটা করে না। 'বংশধর' বলছি, এরা ঐ দলেরই লোক, যারা রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। কিন্তু আজকের দিনে জে আর সোনা পাওয়ার গুজোব ভাল করে রটতে পারে না,—তার আগেই খবরের কাগজওয়ালা প্লেন ভাড়া করে সব কিছু তদারক করে জানিয়ে দেয়, সমস্তটা ধাপ্পা। কিংবা জাহাজ ভাড়া করার কথাও ওঠে না। প্লেনে করে ঝটপট সব-কিছু সারা যায়। হেলিকপ্টার হওয়াতে আরো সুবিধে হয়েছে। একেবারে মাটির গা ছুঁয়ে ভালো করে সব কিছুই তদারক করা যায়।'

তাই এরা সব করে আফিং চালান, কিংবা মনে করো, কোনো

দেশে বিদ্রোহ হয়েছে—বিদ্রোহীদের কাছে বে-আইনী ভাবে বন্দুক-মেশিনগান ইত্যাদি বিক্রি।

যখন কিছুতেই কিছু হয় না, কিম্বা সামান্য যে টাকা করেছিল তা ফুঁকে দিয়েছে, ওদিকে বয়সও হয়ে গিয়েছে, গায়ে আর জোর নেই, তখন তারা জিবুটির মত লক্ষ্মীছাড়া বন্দরে এসে দু পয়সা কামাবার চেষ্টা করে, আর নূতন নূতন অসম্ভব অসম্ভব অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখে। জিবুটির মত অসহ্য গরম আর মারাত্মক রোগ-ব্যাধির ভিতর কোন্ সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কাজের সন্ধানে আসবে? কিন্তু এদের আছে কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাই এদের জন্য এখানে কিছু একটা জুটে যায়। এই যেমন মনে করো, এখান থেকে যে রেল-লাইন শুরু হয়ে আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবা অবধি গিয়েছে—প্রায় পাঁচ শ মাইলের ধাক্কা—সে লাইনে তো নানা রকমের কাজ আছেই, তার উপর ওরই মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্য যা হবার তা-ও হয়। ঐ সব করে, আর একে অন্যকে আপন আপন যৌবনের দুঁদেমির গল্প বলে।

পাছে পল ভুল বোঝে তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'কিন্তু এই যে চারটি লোক বসে আছে ঠিক এরাই যে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারার সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে—ঐ-টুকু যা কথা।'

ইতিমধ্যে মুখে একটা মাছি ঢুকে যাওয়াতে বিষম খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলুম। শান্ত হলে পর পল শুধালে, 'এদের কথা শুনে এদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত, না অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

আমি অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানো? কেউ যখন করুণার সন্ধান করে তখনই প্রশ্ন জাগে, এ লোকটা করুণার পাত্র কি না? কিন্তু এরা তো কারো তোয়াক্কা করে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা আশা রাখে, স্বপ্ন দেখে,

রাস্তার মোড় ঘুরতেই, নদীর বাঁক নিতেই সামনে পাবে পরীস্থান, যেখানে গাছের পাতা রুপোর, ফল সোনার, যেখানে শিশিরের ফোঁটাতে হাত দিলেই তারা হীরের দানা হয়ে যায়, যেখানে—'

আরেকটুখানি কবিত্ব করার বাসনা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে পার্সি মাছি তাড়াতে তাড়াতে এসে উপস্থিত। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখলো ও-দ্য-কলনের এক ঢাউস বোতল। মুখে হাসি, চোখে খুশী—বোতলের নয়, পার্সির।

আমি বোতলটা হাতে নিয়ে দেখি, দুনিয়ার সব চাইতে ডাকসাইটে ও-দ্য-কলন—খাস কলন শহরের তৈরী কলনের জল—Eau de Cologne! 4711 মার্কা!

পার্সি বললে, 'দাঁও মেরেছি স্যর! বলুন তো এর দাম বোম্বাই কিম্বা লণ্ডনে কত?'

আমি বললুম, 'শিলিং বারো চোদ্দ হবে।'

লঙ্কা জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেও বোধ হয় রামচন্দ্রজী এতখানি পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন নি। তবু হনুমান কি করেছিলেন তার খানিকটে আভাস পেলুম, পার্সির বুক চাপড়ানো দেখে।

'তিন শিলিং, স্যর, তিন শিলিং! সবে মাত্র, কুল্‌লে, জস্‌ট্, তিন শিলিং! নট্ এ পেনি মোর, নট ঈভন এ রেড ফার্দিং মোর।'

এমন সময় দেখি, কাফের আরেক কোণ থেকে সেই আবুল-আসফীয়া—কি কি যেন—সিদ্দীকী সায়েব তার সেই লম্বা কোট আর ঝোলা পাতলুন পরে আমাদের দিকে আসছেন। ইনি আমাদের সেই বন্ধু যিনি সবাইকে লাইমজুস, চকলেট খাওয়ান—কিন্তু যাঁর কঞ্জুসি কথা কওয়াতে।

আমরা উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালুম।

তিনি বসেই বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তাররা যে রকম এক্‌স্‌রে'র প্লেট দেখে সেই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

পার্সি পুনরায় মৃদু হাস্য করে বললে, 'একদম খাঁটি জিনিস।'

আবুল আসফীয়া মুখ বন্ধ রেখেই নাক দিয়ে বললেন, 'হুঁ।'

তারপর অনেকক্ষণ পরে অতি অনিচ্ছায় মুখ খুলে শুধালেন, 'ওটা কার জন্য কিনলে?'

পার্সি বললে 'পিসিমার জন্য।'

আবুল আসফীয়া বললেন, 'বোতলটার ছিপি না খুললে বিলেতে নামবার সময় তোমাকে প্রচুর কাস্‌টম্‌সের ট্যাক্স দিতে হবে। এমন কি এ জাহাজে ওঠার সময়ও—তবে সে আমি ঠিক জানিনে।'

পার্সি আমার দিকে তাকালে।

আমি বললুম, 'ছিপি খোলা থাকলে ওটা তোমার আপন ব্যবহারের জিনিস হয়ে গেল; তাই ট্যাক্স দিতে হয় না।'

অনেকক্ষণ পর আবুল আসফীয়া বললেন, 'যখন খুলতেই হবে তখন এই বেলা খুলে ফেলাই ভালো।'

আমরা সবাই—পার্সিও—বললুম, 'সেই ভালো।'

ওয়েটার একটা কর্কস্ক্রু নিয়ে এল। আবুল আসফীয়া পরিপাটি হাতে বোতল খুলে প্রথম কর্কটার ভিতরের দিক শুঁকলেন, তারপর বোতলের জিনিস।

একটু ভেবে নিয়ে আমাদের শোঁকালেন।

কোনো গন্ধ নেই!

যেন জল—প্লেন, 'নির্জলা' জল!

পার্সি তো একেবারে হতভম্ব। অনেকক্ষণ পর সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু ছিপি, সীল সবই তো ঠিক?'

আবুল আসফীয়া বললেন, 'এ সব ছোট বন্দরে পুলিসের কড়াক্কড়ি নেই বলে নানা রকমের লোক অনেক অজানা প্রক্রিয়ায় আসল জিনিস সরিয়ে নিয়ে মেকি কিম্বা প্লেন জল চালায়।'

আমি পলকে কানে কানে বললুম, 'হয়তো আমাদেরই একজন 'অ্যাডভেঞ্চারার'।'

পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, খাস জিবুটি-বাসিন্দারা

দরদ-ভরা আঁখিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অনুমান করতে বেগ পেতে হল না, এরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

পার্সিও খানিকটে বুঝতে পেরেছে। বললে, 'যাত্রীরা বোকা কি না, তাই এ শয়তানিটা তাদের উপরই করা যায়। আর প্রতি জাহাজেই আসে এক জাহাজ—'

পল বাধা দিয়ে বললে, 'পার্সি!'

পার্সি চটে উঠে বললে, 'ওঃ, আর উনিই যেন এক মহা কন্‌-ফু-ৎস!'

জাহাজে ফেরার সময়, আবুল আসফীয়াকে একবার একা পেয়ে শুধালুম, 'ছোঁড়াটাকে বড় নিরাশ করলেন।'

বললেন, 'উপায় কি? না হলে প্রতি বন্দরে মার খেত যে!'

৮

গুণীরা বলেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলবে।

জিবুটি ত্যাগ করার সময় পার্সি বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটা।' ও-ত্য-কলমের খেদটা তখনো তার মন থেকে যায় নি। তাই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কথাটা বললো।

ঘণ্টা খানেকের ভিতর উঠল ঝড়। তেমন কিছু মারাত্মক নয় কিন্তু 'সী সিকনেস্' দিয়ে মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পার্সিই প্রথম বিছানা নিল। বমি করতে করতে তার মুখ তখন সরষে ফুলের রঙ ধরেছে। ভাঙা গাল দুটো দেখে মনে হয় সত্তর বছরের বুড়ো।

আমি নিজে যে খুব সুস্থ অনুভব করছিলুম তা নয়; তবু পার্সিকে বললুম, 'তবে যে, বৎস, জিবুটি বন্দরকে কটু-কাটব্য করছিলে? এখন ঐ লক্ষ্মীছাড়া বন্দরেই পা দিতে পারলে যে দু মিনিটেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে। মাটিকে তাচ্ছিল্য করতে নেই—অন্তত যতক্ষণ মাটির থেকে দূরে আছ—তা সে জলের তলাতে সাবমেরিনেই হোক, উপরে জাহাজেই হোক, কিম্বা তারো উপরে বাতাসে ভর করে অ্যারোপ্লেনেই হোক। তা সে যাকগে। এখন বুঝতে পারলে গুণীরা কেন বলেছেন, অগ্র-পশ্চাৎ ইত্যাদি?'

পার্সি কিন্তু তৈরী ছেলে। সেই ছটফটানির ভিতর থেকে কাতরাতে কাতরাতে বললে, "কিন্তু এখন যদি কোনো ডুবন্ত দ্বীপের মাটিতে ধাক্কা লেগে জাহাজখানা চৌচির হয়ে যায় তখনো মাটির গুণ-গান করবেন না কি?

আমি বললুম, 'ঐ য্‌ যা! এতখানি ভেবে তো আর কথাটা বলি নি।'

পল তার খাটে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আস্তে আস্তে বললে, 'জাহাজ যদি মাটিতে লেগে চৌচির হয়ে যায় তবে তো সেটা মাটির দোষ নয়। জাহাজ জোরের সঙ্গে ধাক্কা দেয় বলেই তো খানখান হয়ে যায়। আস্তে আস্তে চললে মাটির বাধা পেয়ে জাহাজ বড় জোর দাঁড়িয়ে যাবে—ভাঙবে কেন? মা'কে পর্যন্ত জোরে ধাক্কা দিলে চড় খেতে হয়, আর মাটি দেবে না?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'সাধু, সাধু! তুলনাটি চমৎকার। তবে কি না আমার দুঃখ, বাঙলা ভাষায় এ নিয়ে যে শব্দ দুটো আছে তার pun তোমরা বুঝবে না। মা হচ্ছেন 'মাদার' আর 'মাটি' হচ্ছেন 'দি মাদার' কিংবা 'আর্থ'।'

পল বললে, 'বিলক্ষণ বুঝেছি, 'Good Earth'।

পার্সি বিরক্ত হয়ে বললে, 'পলের তুলনাটা নিশ্চয়ই চোরাই মাল।'

আমি বললুম, 'সাধুর টাকাতে দু সের দুধ, চোরের টাকাতেও দু সের দুধ। টাকার দাম একই। তুলনাটা ভালো। তা সে পলের আপন মালই হোক আর চোরাই মালই হোক। তা সে কথা থাক। তুমি কিন্তু 'সী সিকনেসে' কাতর হয়ে ভয় পেয়ো না। এ ব্যামোতে কেউ কখনো মারা যায় নি!'

পার্সি চিঁ-চিঁ করে বললে, 'শেষ ভরসাটাও কেড়ে নিলেন, স্যর? আমি তো ভরসা করেছিলুম, আর বেশীক্ষণ ভুগতে হবে না, মরে গিয়ে নিষ্কৃতি পাবো।'

পল বললে 'আগাছা সহজে মরে না।'

আমি বললুম 'থাক, থাক। চলো, পল, উপরে যাই। আমরা তিনজনা মিলে 'সী সিক্‌নেস্‌কে' বড্ড বেশী লাই দিচ্ছি।'

পল বেরতে বেরতে বললে, 'হক কথা। পার্সির সঙ্গে একা পড়লে যে-কোনো ব্যামো বাপ-বাপ করে পালাবার পথ পাবে না।'

উপরে এসে দেখি, আবুল আসফিয়া কোথা থেকে এক জোরদার দূরবীন যোগাড় করে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এ সব জাহাজ কখনো পাড়ের গা ঘেঁষে চলে না। তাই জোরালো দূরবীন দিয়েও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। পল আমাকে শুধালে, 'কি দেখছেন উনি ?'

আমি বললুম, 'আবুল আসফিয়া মুসলমান এবং মনে হচ্ছে ধর্মে তাঁর অনুরাগও আছে। লাল দরিয়ার এক পারে সোমালি-ভূমি, হাবসী মুল্লুক এবং মিশর, অন্য পারে আরব দেশ। মহাপুরুষ মুহম্মদ আরব দেশে জন্মেছিলেন, ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। মক্কা-মদীনা সবই তো ঐখানে।'

পল বললে, 'ইংরিজিতে যখনই কোনো জিনিসের কেন্দ্রভূমির উল্লেখ করতে হয় তখন বলা হয়, যেমন ধরুন সঙ্গীতের বেলায়, 'ভিয়েনা ইজ দি মেক্কা অব মিউজিক'—এ তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বিশেষ করে মক্কা বলা হয় কেন ? মক্কা তো আর তেমন কিছু বড় শহর নয়।'

আমি বললুম, 'পৃথিবীতে গোটা তিনেক বিশ্বধর্ম আছে, অর্থাৎ এ ধর্মগুলো যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন মনে করো বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম। কিন্তু পৃথিবীর বহু বৌদ্ধ কিম্বা খ্রীষ্টান কোনো বিশেষ পুণ্যদিবসে এক বিশেষ জায়গায় একত্র হয় না—মুসলমানরা যে রকম হজের দিনে মক্কায় একত্র হয়। কোথায় মরক্কো, কোথায় সাইবেরিয়া আর কোথায় তোমার চীন—পৃথিবীর যে সব দেশে মুসলমান আছে সে সব দেশের লোককে সেদিন তুমি মক্কায় পাবে। শুনেছি, সেদিন নাকি মক্কার রাস্তায় দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়।'

'তাতে করে লাভ ?'

আমি বললুম, 'লাভ [illegible] নিশ্চয়ই হয়। তীর্থযাত্রীরা

যে পয়সা খরচ করে তার সবই তো ওরা পায়। কিন্তু আসলে সে উদ্দেশ্য নিয়ে এ-প্রথা সৃষ্টি হয় নি। মুহম্মদ সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সব দেশের মুসলমানকে যদি একত্র করা যায় তবে তাদের ভিতর ঐক্য এবং ভ্রাতৃভাব বাড়বে। আমরা যখন বাড়িতে উপাসনা না করে গির্জায় কিম্বা মসজিদে যাই তখন তারও তো অন্যতম উদ্দেশ্য আপন ধর্মের লোকের সঙ্গে এক হওয়া। মুহম্মদ সাহেব বোধ হয় এই জিনিসটাই বড় করে, সমস্ত পৃথিবী নিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

পল অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, 'আমরা তো বড় দিনের পরবে প্রভু যীশুর জন্মস্থল বেথলেহেমে জড়ো হইনে। হলে কি ভালো হত না? তা হলে তো খ্রীষ্টানদের ভিতরও ঐক্য সখ্য বাড়তো।'

আমি আরো বেশী ভেবে বললুম, 'তা হলে বোধ হয় রোমে পোপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হত।'

কিন্তু থাক এসব কথা। আমার কোনো ক্যাথলিক পাঠক কিম্বা পাঠিকা যেন মনে না করেন যে আমি পোপকে শ্রদ্ধা করিনে। পৃথিবীর শত শত লক্ষ লক্ষ লোক যাঁকে সম্মানের চোখে দেখে তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই শত শত লক্ষ লক্ষ লোককে অশ্রদ্ধা করা হয়। অতটা বেয়াদব আমি নই। বিশেষত আমি ভারতীয়। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

৯

ঝড় থেমেছে। সমুদ্র শান্ত। ঝড়ের পর বাতাস বয় না বলে অসহ্য গরম আর গুমোট। এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই কি প্রকারে?

নিষ্কৃতির জন্য মানুষ ডাঙায় যা করে, জলে অর্থাৎ জাহাজেও তা-ই। এক দল লোক বুদ্ধিমান। কাজে কিংবা অকাজে এমনি ডুব মারে যে, গরমের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকখানি অচেতন হয়ে যায়। বোকার দল শুধু ছটফট করে। ক্ষণে এটা করে, ক্ষণে ওটা নাড়ে, ক্ষণে ঘুমাবার চেষ্টা করে, ক্ষণে জেগে থাকতে গিয়ে আরো বেশী কষ্ট পায়।

জাহাজেও তাই। একদল লোক দিবা-রাত্তির তাস খেলে। সকাল বেলাকার আণ্ডা-রুটি খেয়ে সেই যে তারা তাসের সায়রে ডুব দেয়, তারপর রাত বারোটা একটা-তুটো অবধি তাদের টিকি টেনেও সে সায়র থেকে তোলা যায় না। লাঞ্চ সাপার খেতে যা তু-একবার তাস ছাড়তে হয়, ব্যস্—ঐ। তখন হয় বলে 'কী গরম', নয় ঐ তাসের জেরই খানার টেবিলে টানে। চার ইস্কাপন্ না ডেকে তিন বে-তুরুপ বললে ভালো হত, পুনরপি ডবল না বলে সে কি আহাম্মুকিই না করেছে!

জাহাজের বে-সরকারি ইতিহাস বলে, একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা তাস খেলেছে এমন ঘটনাও নাকি বিরল নয়। এরা গরমে কাতর হয় না, শীতেও বেকাবু হয় না। ভগবান এদের প্রতি সদয়।

দাবাখেলার চর্চা পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে। আসলে কিন্তু দাবাড়েরাই এ ব্যাপারে তুনিয়ার আর সবাইকেই মাত করতে পারে। দাবাখেলায় যে মানুষ কি রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতে পারে,

সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 'পরশুরাম' লিখেছেন, এক দাবাড়েকে যখন চাকর এসে বললে, 'চা দেব কি করে?—দুধ ছিঁড়ে গেছে'। তখন দাবাড়ে খেলার নেশায় বললে, 'কি জ্বালা, সেলাই করে নে না।'

আরেক দল শুধু বই পড়ে। তবে বেশীর ভাগই দেখেছি, ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভালো বই দিবা-রাত্র পড়ছে এরকম ঘটনা খুব কমই দেখেছি।

আরেক দল মারে আড্ডা। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে—আড্ডার যেটা প্রধান 'মেনু'—পরনিন্দা, পরচর্চা। সেগুলো বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাছে কোনো পাঠক ফস করে শুধায়, 'এগুলো আপনি জানলেন কি করে, যদি নিজে পরনিন্দা না করে থাকেন? তাই আর বললুম না।'

আরো নানা গুষ্ঠী নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু আবুল আসফিয়া কোনো গোত্রেই পড়েন না। তিনি আড্ডাবাজদের সঙ্গে বসেন বটে, কিন্তু আড্ডা মারেন না—খেয়া-নৌকার মাঝি যে রকম নদী পেরয়, কিন্তু ওপারে নাবে না। একথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁকে দেখি অন্য রূপে। খুলে কই।

পার্সি সেরে উঠে আবার জাহাজময় লম্ফ-ঝম্ফ লাগিয়েছে। যেখানেই যাই সেখানেই পার্সি। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তবে কি পার্সির জন আষ্টেক যমজ ভাই আছে না কি? একই লোক সাত জায়গায় এক সঙ্গে থাকবে কি করে?

সে-ই খবরটা আনলে।

কি খবর?

জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌঁছনোর পর ঢুকবে সুয়েজ খালে। খালটি একশ মাইল লম্বা। দু পাড়ে মরুভূমির বালু বলে জাহাজকে এগতে হয় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে। তাহলে লাগল প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা। খালের এ-মুখে সুয়েজ বন্দর, ও-মুখে সঈদ বন্দর।

আমরা যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে ট্রেন ধরে কাইরো চলে যাই এবং পিরামিড দেখে সেখান থেকে ট্রেন ধরে সঈদ বন্দর পৌঁছই, তবে আমাদের আপন জাহাজই আবার ধরতে পারবো। যদিও আমরা মোটামুটি একটা ত্রিভুজের দুই বাহু পরিভ্রমণ করব—আর সুয়েজ খাল মাত্র এক বাহু—তবু রেলগাড়ি তাড়াতাড়ি যাবে বলে আমরা কাইরোতে এটা ওটা দেখবার জন্য ঘণ্টা দশেক সময় পাবো।

কিন্তু যদি সুয়েজ বন্দরে নেমে সময় মত ট্রেন না পাই, কিম্বা যদি কাইরো থেকে সময় মত সঈদ বন্দরের ট্রেন না পাই আর সেখানে জাহাজ না ধরতে পারি, তখন কি হবে উপায়?
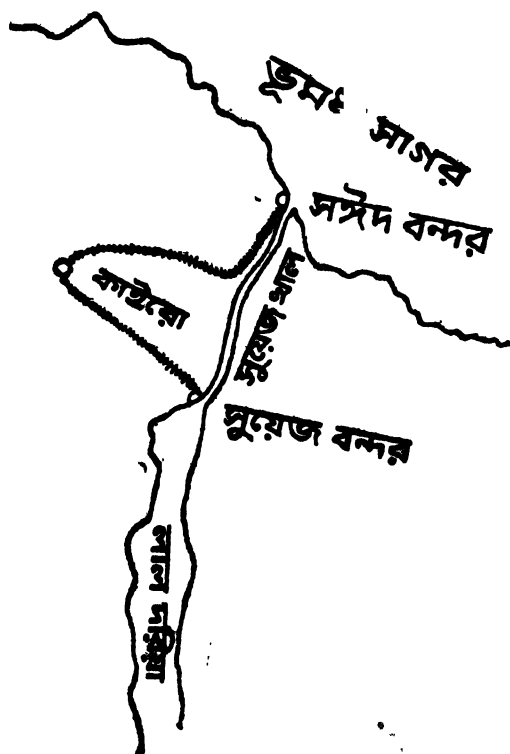
পার্সি অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'সে তো কুক কোম্পানির জিম্মাদারি। তারাই তো এ টুর—না এক্‌স্‌কার্শন, কি বলবো?—বন্দোবস্ত

করেছে। প্রতি জাহাজের জন্যই করে। বিস্তর লোক যায়। চলুন না, নোটিশ বোর্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি—কুকের বিজ্ঞাপন।'

ত্রিমূর্তি সেখানে গিয়ে সাতিশয় মনোযোগ সহকারে প্রস্তাবটি অধ্যয়ন করলুম।

কিন্তু প্রস্তাবটির শেষ ছত্র পড়ে আমাদের আক্কেল গুড়ুম নয়, দড়াম করে ফেটে গেল। এই এক্স্কার্শন—বন-ভোজ কিম্বা শহর-ভোজ, যাই বলো, যাচ্ছি তো কাইরো 'শহরে'—যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রত্যেককে দিতে হবে সাত পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় একশ' টাকা। পল বললে, 'হরি, হরি' (অবশ্য ইংরিজিতে 'গুড হেভেনস,' 'মাই গুডনেস' এই জাতীয় কিছু একটা) এত টাকা যদি আমার থাকবেই তবে কি আমি এই জাহাজে ফার্স্ট ক্লাসে যেতুম না?'

আমি বেদনাতুর হওয়ার ভান করে বললুম, 'কেন ভাই, আমরা কি এতই খারাপ লোক যে আমাদের এড়াবার জন্য তুমি ফার্স্ট ক্লাসে যেতে চাও?'

পল তো লজ্জায় লাল হয়ে তোতলাতে আরম্ভ করলে।

আর পার্সি? সে তো হনুমানের মত চক্রাকারে নৃত্য করে বলতে লাগল, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। করো মস্করা স্যরের সঙ্গে। বোঝো ঠ্যালা!'

আমি বললুম, 'ব্যস্, ব্যস্। হয়েছে। হয়েছে। কিন্তু পার্সি, একশ' টাকা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আমাকেই তো টাল-টামাল হয়ে টাকাটা টানতে হবে।'

পার্সিকে দমানো শক্ত। বললে, 'অপরাধ নেবেন না, স্যর, কিন্তু আমি-ই বা কোন হেনরি ফোর্ড কিংবা মিডাস্ রোট্শিল্ট্? কিন্তু আমি মনস্থির করেছি, আমার জেবের শেষ পেনি দিয়ে আমি পিরামিড দেখবই দেখব। চীনা দেওয়াল দেখার পর পিরামিড দেখব না আমি? মুখ দেখাবো তা হলে কি করে? তার চেয়েও খারাপ, আয়নাতে নিজেরই মুখ দেখব কি করে?'

অনেক আলোচনা, বিস্তর গবেষণা করা হল। শেষটায় স্থির হল, পিরামিড-দর্শন আমাদের কপালে নেই। গালে হাত দিয়ে যখন ত্রিমূর্তি আপন মনে সেই শোক ভোলবার চেষ্টা করছি এমন সময় আবুল আসফিয়া মুখ্‌ খুললেন।

তাঁর সনাতন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি আমাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি। আমরা যখন স্থির করলুম, আমরা ট্রিপটা নেব না তখন তিনি বললেন, 'এর চেয়ে সস্তাতেও হয়।'

আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে শুধালুম, 'কি করে? কি করে?'

বললেন, 'সে কথা পরে হবে।'

তার পর আপন চেয়ার ছেড়ে খানা-কামরার দিকে চলে গেলেন।

পল আর পার্সিকে এখন আর বড় একটা দেখতে পাইনে। ওরা আবুল আসফিয়ার কোটের উপর ডাকটিকিটের মত, সেঁটে বসেছে—ছিনে জোঁকের মত, লেগে আছে বললে কমিয়ে বলা হয়, কারণ, রক্ত শোষা শেষ হলে তবু ছিনে জোঁক কামড় ছাড়ে—এরা খামের উপর ডাক-টিকিটের মত, যেখানেই আবুল আসফিয়া সেখানেই তারা। মুখে এক বুলি, এক প্রশ্ন—কি করে সস্তায় কাইরো গিয়ে সেখান থেকে সস্তাতেই ফের সঈদ বন্দরে জাহাজ ধরা যায়? আবুল আসফিয়া বলেন, 'হবে, হবে, সময় এলে সবই হবে।'

শেষটায় জাহাজ যেদিন সুয়েজ বন্দরে পৌঁছবে তার আগের দিন তিনি রহস্যটি সমাধান করলেন। অতি সরল মীমাংসা। আমাদের মাথায় খেলেনি।

আবুল আসফিয়া বললেন, 'কুক কোম্পানির লোক টুরিস্ট্ সায়েব-সুবোদের নিয়ে যাবে গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে করে—সুয়েজ থেকে কাইরো, এবং কাইরো থেকে সঈদ বন্দর। কাইরোতে যে রাত্রি-বাস করতে হবে তার ব্যবস্থাও হবে অতিশয় খানদানী, অতএব মাগগী হোটেলে। আমরা যাব থার্ডে, এবং উঠবো একটা সস্তা হোটেলে। তা হলেই হল।'

প্রথমটায় আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সম্বিতে ফেরা মাত্র আমার মনে আরেকটি কঠিন সমস্যার উদয় হল। যদি কোনো জায়গায় আমরা ট্রেন মিস করি কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যাই আর শেষটায় সঈদ বন্দরে ঠিক সময়ে পৌঁছে জাহাজ না ধরতে পারি তবে যে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বরঞ্চ চা খেতে

প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, আর গাড়ি মাল-পত্র নিয়ে চলে গেল সে সমস্যারও সমাধান আছে কিন্তু জাহাজ চলে গেলে কত দিন সঈদ বন্দরে পড়ে থাকতে হবে, তার কি খরচা, নূতন জাহাজে নূতন টিকিটের জন্য কি গচ্ছা এসব তো কিছুই জানিনে। কুকের লোক এ সব বিপদ-আপদের জন্য জিম্মেদার, কিন্তু আবুল আসফিয়াকে জিম্মেদার করে তো আর আমাদের চারখানা হাত গজাবে না? তাঁকে তো আর বলতে পারবো না, 'মশাই, আপনার পাল্লায় পড়ে এত টাকার গচ্ছা হল—আপনি সেটা ঢালুন।'

শেষের কথাটা বাদ দিয়ে আমার সমস্যাটা নিবেদন করাতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় মাত্র একটি বাক্য বললেন, 'নো রিস্ক, নো গেন'—সোজা বাঙলায়, 'খেলেন দই রমাকান্ত আর বিকারের বেলা গোবদ্দন' সে হয় না। তুমি যদি দই খেতে চাও তবে বিকারটা হবে তোমারই। মাগুর মাছ ধরতে হলে গর্তে হাত দিতে হবে তোমাকেই। কিছুটা ঝুঁকি নিতে রাজী না হলে কোনো প্রকারের লাভও হয় না।

আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক, নো গেন' এই চারটি কথা—চাট্টিখানি কথা নয়—শুনে পল দুশ্চিন্তা-ভরা গলায় বললে, 'তাই তো!'

পার্সি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললে, 'সেই তো।'

আমি বললুম, 'ঐ তো।'

পল বললে, 'কিংবা মনে করুন কাইরোতে পথ হারিয়ে ফেললুম। আবুল আসফিয়া কি কাইরোর ভাষা জানেন? সেখানকার লোকে কি বুলি বলে তার নামই তো জানিনে।'

পার্সি বললে, 'দেখো পল, তুমি কি কি জানো না তার ফিরিস্তি বানাবার এই কি প্রশস্ততম সময়? তাতে আবার সময়ও তো লাগবে বিস্তর।'

আমি পার্সিকে ফাঁকা ধমক দিয়ে বললুম, 'আবার!' পলকে

বললুম, 'আরবী। কিন্তু কিছু কিছু লোক নিশ্চয়ই ইংরিজি ফরাসী জানে। রাস্তা ফের খুঁজে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

পল বললে, 'যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

আরো অনেক অসুবিধার কথা উঠল। তবে সোজা কথা এই দাঁড়ালো, 'একটা দেশের ভাষার এক বর্ণ না জেনে, এতখানি কম সময় হাতে নিয়ে সে দেশে ঘোরাঘুরি করা কি সমীচীন? এতই যদি সোজা এবং সস্তা হবে তবে এতগুলো লোক কুকের ন্যাজ ধরে যাচ্ছে কেন? একা-একা কিংবা আপন-আপন দল পাকিয়ে গেলেই পারতো। তাই দেখা যাচ্ছে আবুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক্, নো গেন' প্রবাদে—অন্তত এক্ষেত্রে—'রিস্ক্' ন' সিকে, গেম্ মেরে-কেটে চোদ্দ পয়সা। রবি ঠাকুর বলেছেন,

'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।'

যদি আমাদের রিস্ক সাতান্ন আর গেন্ তিন-চল্লিশ হত তা হলে আমারা সোল্লাসে কানাইলালের মত 'ইয়াল্লা' বলে ঝুলে পড়তুম—যাচ্ছি তো মুসলমান দেশে।

তখন স্থির হল, আবুল আসফিয়াকে পাকড়াও করে আরেক দফা সবিস্তর সওয়াল জবাব না করে কোনো কিছু পাকাপাকি মনস্থির করা যাবে না।

ধুয়া-ভুয়া করে করে, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর আমরা আবুল আসফিয়াকে পেলুম উপরের ডেকের এক কোণে, আপন মনে গুনগুনিয়ে গান গাইছেন। আমাদের দেখে, আমাদের কিছু বলার পূর্বেই বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাইনে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারবো না। আমি কাইরো যাবো। তোমরা আসতে চাও ভালো, না আসতে চাও আরো ভালো।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো একটা শব্দ শুনতে পেলুম—শব্দটা ফার্সী, 'বুজ-দিল'—অর্থাৎ বকরির কলিজা, অর্থাৎ 'ভীতুরা সব।'

এই শান্ত প্রকৃতি সদাশিব লোকটির কাছ থেকে আমরা এ-আচরণ প্রত্যাশা করিনি। এ যেন সেনাপতির আদেশ, 'আমি তা হলে একাকী শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করবো, তোমরা আসো আর নাই আসো।' ত্রিমূর্তি লগুড়াহত সারমেয়বৎ নিম্নপুচ্ছ হয়ে স্ব-স্ব আসনে ফিরে এলুম। কারো মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে আহারাদি করে যে যার কেবিনে শুয়ে পড়লুম।

'সিংহের ল্যাজে মোচড় দিতে নাই', কথাটি অতি খাঁটি, কিন্তু আবুল আসফিয়া সিংহ না মর্কট সেটা তো এখনো কিছু বোঝা গেল না। তাঁর আচরণ তেজীয়ান না লেজীয়ানের লক্ষণ তার তো কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে কেবিন ছেড়ে উপরে আসতেই দেখি হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। এক দল লোক আবুল আসফিয়াকে ঘিরে নানা রকমের প্রশ্ন শুধোচ্ছে। কুক কোম্পানি কাইরো দেখবার জন্য চায় এক শ' টাকা, আর আপনি বলেন, পঞ্চাশ টাকাতেই হয়, সেটা কি প্রকারে সম্ভব? আরেক দল বলে, তারাও আসতে রাজী কিন্তু যদিস্যাৎ কোনো প্রকারের গড়বড়-সড়বড় হয়ে যায় আর তারা জাহাজ না ধরতে পারে তখন যে ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হবে তার কি সমাধান?

অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমাদেরই মত আমাদের গরীব সহযাত্রীরা জেনে গিয়েছে সস্তাতেও কাইরো এবং পিরামিড দেখা যায়। কাজেই এখন আর পল, পার্সি, আমি, এই ত্রিমূর্তি, এবং আবুল্ আসফিয়াকে নিলে চতুর্মুখ—এখন আর তা নয়, এখন সমস্যাটা সহস্রনয়না হয়ে গিয়েছে, জনগণমন সাড়া দিয়েছে।

আবুল্ আসফিয়া কেবল মাঝে মাঝে বলেন, 'হো জায়গা, সব কুছ হো জায়গা।'

হিন্দুস্তানী বলছেন কেন? তিনি তো ইংরিজী জানেন। তখন লক্ষ্য করলুম, যে সব দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের ভিতর রয়েছে ফরাসী, জর্মন, স্পেনিশ, রুশ আরো কত কি। এরা সবাই বোঝে, এমন কোনো ভাষা ইহ-সংসারে নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে মাতৃভাষায় কথা বলে যাচ্ছেন। ইংরিজী বললে যা, হিন্দুস্থানী বললেও তা। ফল একই।

এমন সময় আমাদের দলের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা মধুর এবং

দরদভরা গলায় বললেন, 'মসিয়ো আবুল, যদি কোনো কারণে আমারা জাহজ মিস্ করি তখন যে আমরা মহা বিপদে পড়বো। আপনি তো আমাদের কাউকে তার অনিচ্ছায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন না যে আপনাকে তখন জিম্মাদার হতে বলবো ?'

ক্লোদেৎ শেনিয়ের যা বললেন, তার মোটামুটি অর্থ, 'আপনি যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তার জিম্মাদারি আপনার নয়, কিন্তু যদি কোনো রকমের বিপর্যয় উপস্থিত হয় তবে তার গুরুত্বটা আপনি ভালো করে বিবেচনা করে দেখলে হয় না কি ?'

উপস্থিত সকলের মনোভাব মহিলাটি যেন অতি ললিত ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। সবাই চিৎকার করে সায় দিলে আপন আপন ভাষায়।

ফরাসী দল—উই উই,
জর্মন দল—ইয়া ইয়া,
ইতালীয় দল—সি সি,
একটি রাশান—দা দা,
গুটি কয়েক ভারতীয়—ঠিক হৈ ঠিক হৈ,
পল পার্সি—ইয়েস ইয়েস,

আমি নিজে কিছু বলিনি,—কিন্তু সে কথা যাক্।

আবুল আসফিয়া উত্তরে ঘাড় নিচু করে বললেন, 'মৈ জিম্মেদার হুঁ।'

তাঁকে যদিও কেউ জিম্মেদার হবার শর্ত চায়নি তবু তিনি জিম্মাদার, এটা সম্পূর্ণ তাঁরই দায়িত্ব।

চাকরির সন্ধানে গিয়ে এক বাঙালী বড় সায়েব ইংরেজকে করার জন্য বলেছিল, 'হুজুর, আপনার বাঙলোতে আসবার জন্য ভয়ের চোটে পা আর ওঠে না। যদি এক পা এগোই তো তিন কদম পিছিয়ে যাই।' বড় সায়েব মাত্রই যে গাধা হয় তা নয়,—এ সায়েবের বুদ্ধি ছিল। বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই শুধালো, 'তা হলে এখানে পৌঁছলে কি করে?' সায়েব যে বাবুর বিনয় বচন এতখানি শব্দার্থে নেবেন বেচারী সেটা অনুমান করতে পারেনি। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু চাকরির ফিকিরে বাঙালীর কাছে কোনো কসরত কোনো কৌশলই অজানা নেই। একটিমাত্র শুকনো ঢোক না গিলেই বললে, 'হুজুর, তাই আমি আপন বাড়ির দিকে মুখ করে চলতে আরম্ভ করলুম আর এই দেখুন দিব্য হুজুরের বাঙলোতে পৌঁছে গিয়েছি।'

গল্পের বাকিটা আমার মনে নেই, তবে আবুল আসফিয়ার কাইরো ভ্রমণ প্রস্তাবে উমেদাররা যদি এক পা এগোন তবে তিন পা পিছিয়ে যান। পল, পার্সি আর আমি ছাড়া কেউই পাকাপাকি কথা দেন না, আমাদের পার্টিতে আসছেন কি না। অথচ ঘড়িঘড়ি তরো-বেতরো প্রশ্ন। গাড়ি যদি মিস্ করি, কাইরোতে হোটেলে যদি জায়গা না মেলে, যদি রাত্রিবেলা হয় আর আকাশে চাঁদ না থাকে তবে পিরমিড দেখব কি করে, আরো কত কি বিদঘুটে সব প্রশ্ন। ওদিকে আবুল আসফিয়া আপন কেবিনে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন। প্রশ্নের ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাদেরই—আমরা যেন ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের ভারতীয় ভাইস্‌রয়। শেষটায় আমরাও গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করলুম।

সন্ধ্যের ঝোঁকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌঁছল। সুয়েজ খালের মুখে এসে জাহাজ নোঙর ফেলতেই ডাঙা থেকে একটা স্টীম-লঞ্চ এসে জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তখন জানা গেল আবুল আসফিয়ার দলে সবসুদ্ধ আমরা নজন যাচ্ছি। তাঁকে নিয়ে দশ জন।

কুকের গাইড স্টীম-লঞ্চে করে ডাঙা থেকে জাহাজে এসেছিল। দেখলুম, তার দলে বারো জন যাত্রী। তা হলে আমাদের দশ জন এমন মন্দ কি!

গাইড চড়চড় করে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে নামলো—পিছনে পিছনে তার দলের বারো জন নামলো পাণ্ডা-গোরুর ন্যাজ ধরে পাপী যে রকম ধারা বৈতরণী পেরোয়। আমাদের আবুল আসফিয়াও চচ্চড় করে নামলেন যেন কত যুগের ঝানু গাইড!

কুকের গাইড এ রকম ব্যাপার আগে কখনো দেখেনি। তার তদ্বিরি জিম্মেদারি উপেক্ষা করে এক পাল লোক চলেছে আপন গোঠ বেঁধে—এতখানি রিস্‌ক্ নিয়ে—এ ব্যাপার তার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আবুল আসফিয়ার দিকে যে ধরনে তাকালে তাতে সে দুর্বাসা হলে তিনি নিশ্চয়ই পুড়ে খাক হয়ে যেতেন—উনিই তো তার মক্কেল মেরেছেন।

তখন ভালো করে দেখলুম আবুল আসফিয়ার নবীন বেশভূষা। সেই ঝুলে-পড়া আঠারো-পকেটি কোট, মাটি-ছোঁয়া চোঙা-পানা পাতলুন তিনি বর্জন করে পরেছেন, একদম ফার্স্ট ক্লাস নেভি ব্লু স্যুট —কোট, পাতলুন ওয়েস্ট কোট সমেত—সোনালি বেনারসি সিল্কের টাই, তদুপরি ডাইমণ্ড টাই-পিন, পায়ে পেটেন্ট লেদারের মোলায়েম জুতো, তদুপরি ফন্ রঙের স্প্যাট, মাথায় উচ্চাঙ্গের ফেল্ট্ হ্যাট্, গরম বলে বাঁ হাতে ধরে রেখেছেন, নেবু রঙের কিড্ গ্লাভস্, ডান হাতে চামড়ার একটি পোর্টফোলিয়ো।

বিবেচনা করলুম, এই স্যুটে আঠেরোটা পকেট নেই বলে তিনি পোর্টফোলিয়োতে টফি চকলেট, সিগার সিগরেট ভর্তি করেছেন।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আর আপন নীলে মিলে বেগ্‌নি রঙ ধরতে আরম্ভ করলে। তারই আভাতে লাল দরিয়ার আনীল জলে ফিকে বেগ্‌নি রঙ ধরে নিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর থেকে, একশ মাইল পেরিয়ে আসছে মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া। সে হাওয়া লাল দরিয়ার এই শেষ প্রান্তে তুলেছে ছোট ছোট তরঙ্গ। তার-ই উপর দিয়ে দুলে দুলে আসছে আমাদের স্টীমলঞ্চ। তার রঙ আসলে সাদা কিন্তু এই নীল লাল বেগ্‌নির পাল্লায় পড়ে তারো রঙ যেন বেগ্‌নি হতে আরম্ভ করলে।

স্টীমলঞ্চটি শুভ্রপুচ্ছ রাজহংসবৎ। রাজহাঁস সাঁতার কেটে যাবার সময় যে রকম শুভ্র বীচিতরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, এ তরণীটিও তেমনি প্রপেলারের তাড়নায় জাগিয়ে তুলছে শুভ্র ফেননিভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চক্রাবর্ত। বড় জাহাজের বিরাট প্রপেলার যখন এ রকম আবর্ত জাগায় তখন সেদিকে তাকাতে ভয় করে, মনে হয় ঐ দয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই কিন্তু ক্ষুদে লঞ্চের ছোট্ট ছোট্ট দয়ের একটি সরল মাধুর্য আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যায়।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পিছনে। পদ্মার সূর্যাস্ত, সমুদ্রের সূর্যাস্ত যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ধরে ঠিক তেমনি মরুভূমির সূর্যাস্তও এক দর্শনীয় সৌন্দর্য! সোনালি বালিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বুকে হামা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রঙ বদলাতে থাকে। তার একটা রঙ ঠিক চেনা কোন জিনিসের রঙ সেটা বুঝতে না বুঝতে সে রঙ বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রঙ ধরে ফেলে। আমাদের কথা বাদ দাও, পাকা আর্টিস্টরা পর্যন্ত এই রঙের খেলা দেখে আপন রঙের পেলেটের দিকে তাকাতে চান না।

সুয়েজ বন্দরে ইংরেজ সৈন্যদের একটা ঘাঁটি আছে। তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় 'বড় সায়েবের বিবিগুলো নাইতে নেমেছে।' কেউ কেউ আবার ছোট্ট ছোট্ট নৌকো করে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি

করছে। নৌকোগুলি হালফ্যাশনের ক্যাম্বিসে তৈরী। নৌকোর পাঁজর ভেনেস্তা কাঠের দড়-শলা দিয়ে বানিয়ে তার উপর ক্যাম্বিস মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় নৌকো কলাপ্‌সিবল্-পোর্টেবল্ অর্থাৎ নৌ-ভ্রমণের পর ভেনেস্তার পাঁজর আর ক্যাম্বিসের চামড়া আলাদা আলাদা করে নিয়ে, ব্যাগের ভিতর প্যাক্ করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। ওজন দশ সেরের চেয়েও কম। পরিপাটি ব্যবস্থা! অবশ্য নৌকোগুলো খুবই ছোট। দুজন মুখোমুখি হয়ে কায়-ক্লেশে বসতে পারে। মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে জল বাঁচিয়ে টুকিটাকি জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। একজোড়া গুণী দেখি সেখানে একটা পোর্টেবলের উপর রেকর্ড লাগিয়েছে ব্লু ডানয়্যুবের!

ঐ তো মানুষের স্বভাব, কিংবা বলবো বজ্জাতি। যেখানে আছে সেখানে থাকতে চায় না। যে জোড়া ব্লু ডানয়্যুব বাজাচ্ছে তাদের যদি এক্ষুনি ডানয়্যুব নদীর উপরে ভাসিয়ে দাও তবে তারা গাইতে শুরু করবে, 'মাই হার্ট ইজ ইন্ দি হাইল্যাণ্ড; মাই হার্ট ইজ নট্ হিয়ার'!

তাকে যদি তখন তুমি স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডে নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে, 'ইম্ রোজেন-গার্তেন ফন্ সাঁস্যুসী' অর্থাৎ 'সাঁস্যুসীর গোলাপ-বাগানে'—সাঁস্যুসী পৎস্‌দামে, বার্লিনের কাছে। তখন যদি তুমি তাকে বার্লিন নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে ভারতবর্ষের গান। জর্মানীর বড় কবি কি গেয়েছেন শোনো,

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শ্রান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

আম্ গাঙ্গেস্ ডুফ্‌টেট্‌স্ লয়েস্‌টট্‌স্
উন্‌ট্ রীসেন্‌বয়মে ব্ল্যুয়েন,

উন্ট্ শ্যোনে ষ্টিলে মেনশেন
ফর্ লটসস্ল্ মেন ক্লিয়েন।

এবং সেখানেও যখন মন ওঠে না তখন গেয়ে ওঠেন স্বপ্নপুরীর গান, যে পুরী কেউ কখনো দেখেনি, যার সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ জনের কোনোই পরিচয় নেই, কবিরাই শুধু যাকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন—

কোথা হায় সেই আনন্দ নিকেতন?
স্বপ্নেই শুধু দেখি সে ভুবন আমি,
রবিকর এল, কেটে গেছে হায়, যামী
ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।

আখ, ইয়েনস্ লান্ট ডের্ ভনে,
ডাস্ জে ইষ্ অফ্ট্ ইম্ ট্রাউম;
ডখ্ কম্ট্ ডী মর্গেন্জনে,
ফেরফ্লীস্ট্স্ ভী আইটেল্শাউম্।

আমি কিন্তু যেখানে আছি সেখানে থাকতেই ভালোবাসি। নিতান্ত বিপদে না পড়লে আমি আপন গাঁ ছেড়ে বেরতে রাজী হইনে। দেশভ্রমণ আমার দুচোখের দুশ্মন্। তাই যখন রবিঠাকুর আপন ভূমির গান গেয়ে ওঠেন তখন আমি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য আরম্ভ করি। শোনো—

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুল ডাঙায়!

হক না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো, কাকী ?
যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি।
ঐ আমাদের গোলাবাড়ি
গোরুর গাড়ি
পড়ে আছে চাকা ভাঙা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা।
সন্ধ্যেবেলায় গল্প বলে
রাখো কোলে
মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চালতা-শাখে
পেঁচা ডাকে
বাড়ে রাতি।
স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি, কাকী,
দেখব আমায় কে কী করে।
চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

এ ছেলে তার কাকীমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে যা বলেছে সে-ই আমার প্রাণের গান, তাতে আমার সর্ব দেহ-মন সাড়া দেয়। বিস্তর দেশভ্রমণের পর আমি তাই এই ধরনের একটি কবিতা

লিখেছিলুম। কত না ঝুলোঝুলি, তারো বেশী ধন্নে দেবার পরও যখন কোনো সম্পাদক সেটা ছাপতে রাজী হন নি—'বসুমতী'র সম্পাদকও তাঁদেরই এক জন—তখন তোমাদের ঘাড়ে আজ আর সেটা চাপাই কোন অধর্ম বুদ্ধিতে?

ছুম করে ধাক্কা লাগতে সংবিতে ফিরে এলুম। লঞ্চ পাড়ে লেগেছে। কিন্তু এরকম ধাক্কা লাগায় কেন? আমাদের গোয়ালন্দ চাঁদপুরে তো এরকম বেয়াদবী ধাক্কা দিয়ে জাহাজ পাড়ে ভিড়ে না!

আবার!

'সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়,
দেশ পানে মন ধায়।'

১৩

সুয়েজ বন্দর কিছু ফেলনা বন্দর নয়। বন্দরটার 'সামরিক' গুরুত্ব—স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স্—আছে বলে ইংরাজকে তার নৌবহরের একটা অংশ এখানে রাখতে হয়। যে সব গোরাদের ক্যাম্বিসের নৌকয় করে জলকেলি করতে দেখেছিলুম তারাই এই সব নৌবহরের তদারকি করে। ফলে তাদের জন্য এখানে দিব্য একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কিছুই নয়, কিছুই নয়, পূর্বের তুলনায় আজ সুয়েজ বন্দরের কি আর জমক জৌলুস! কেপ অব গুড হোপের পথ না বেরনো পর্যন্ত এমন কি তার পরেও ভারতবর্ষ, বর্মা, মালয়, যবদ্বীপ, চীন থেকে যে-সব জিনিস রপ্তানি হত তার অধিকাংশই সমুদ্রপথে এসে নামত সুয়েজ বন্দরে—এবং ভুললে চলবে না, তখনকার দিনে প্রাচ্যই রপ্তানি করত বেশী। এখান থেকেই ফিনিশিয়ানরা, তার পরে গ্রীক, তার পর রোমান, তার পর আরবরা ভারতের দিকে রওয়ানা হত। ভারত থেকে মাল এনে সুয়েজে নামানো হত। সুয়েজ থেকে একটা খালে করে এসব মাল যেতো কাইরোতে এবং সেখান থেকে নীল নদ বয়ে সে মাল পৌঁছত আলেকজেন্দ্রিয়ায়—আরবীতে যাকে বলে ইস্কন্দরিয়া। সেখান থেকে ভেনিসের মাধ্যমে তাবৎ ইয়োরোপ।

এই সব মাল কেনা-কাটা আমদানি রপ্তানিতে ভারতবর্ষের প্রচুর সদাগর-শ্রেষ্ঠী, মাঝি-মাল্লার বিরাট অংশ ছিল। যে যুগে ভাস্কো-দা-গামা এ পথকে নাকচ করে দেবার জন্য আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসার পথ বের করলেন সে যুগে পূর্বপ্রাচ্যের তাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ভারতীয় এবং সুয়েজ অঞ্চলের মিশরীয়দের হাতে।

এক দিকে ভারতীয় এবং মিশরীয়; অন্য দিকে ভাস্কো-দা-গামার বংশধর পর্তুগীজ দল।

জাত তুলে কথা কইতে নেই, তাই ইসারা-ইঙ্গিতে কই। এই যে পর্তুগীজ গুণ্ডারা গোয়া নিয়ে আজ দাবড়াদাবড়ি করছে এ-কিছু নূতন নয়। ওদের স্বভাব ঐ। এক কালে তারা জলের বোম্বেটে ছিল, এখন তারা ডাঙার গুণ্ডা। 'বোম্বেটে' শব্দের মূল আর অর্থ অনুসন্ধান করলেই কথাটা সপ্রমাণ হবে। 'বোম্বেটে' কিছু বাঙালীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বানানো আজগুবী কথা নয়। 'বোম্বেটে' শব্দ এসেছে ঐ পর্তুগীজদের ভাষা থেকেই—bombardeiro, অর্থাৎ যারা না-বলে না-কয়ে যত্র-তত্র bomba—বোমা ফেলে। হয়তো বলবে, আমাদের কলকাতাতেই কেউ কেউ এরকম বোমা ফেলে থাকে,—কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য এবং ঘৃণ্য যে আজ তাবৎ কলকাতা-বাসীকে কেউ বোম্বেটে নাম দেয় নি। কিন্তু তাবৎ পর্তুগীজরাই এই অপকর্ম করত বলে তাদের নাম হয়ে গেল 'বোম্বেটে'।

ওদের দ্বিতীয় নাম—আমাদের বাঙলা ভাষাতেই—'হারমদ'। সেটাও পর্তুগীজ কথা armada থেকে এসেছে। বিখ্যাত কোষকার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর সুবিখ্যাত অভিধানে এ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পর্তুগীজ জলদস্যুরা যখন বাঙলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম হানা দেয় তখন তাদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালীরা সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমাদের ঘরোয়া কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আছে,—

ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বহিয়া যায় হারমদের ডরে॥'

অর্থাৎ এই সব 'হারমদ'—'armada,' 'বোম্বেটে' 'bombardeiro'দের ডরে তখন দক্ষিণ-বাঙলার লোক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমতে পারত না।

এস্থলে যদিও অবান্তর, তবু প্রশ্ন, বাঙালীরা এত ভয় পেয়ে পালালো কেন?

উত্তরে বলি, যে-কোনো বন্দরে, জাহাজ থেকে নেমে, এক পাল লোক সেটাকে লুট-তরাজ করতে পারে। এটা আদপেই কোনো কঠিন কর্ম নয়, যদি,—

এই খানেই এক বিরাট 'যদি'—

যদি সে রাজা তার সমুদ্র-কূল রক্ষার জন্য নৌবহর মোতায়েন না করেন। জনপদ রক্ষা করার জন্য যে রকম পুলিশ সেপাই রাজাকেই রাখতে হয়, ঠিক তেমনি সমুদ্র-কূলবন্দরের হেপাজতির জন্য রাজাকেই নৌবহর রাখতে হয়।

কিন্তু হায়, তখন বাঙালা দেশ হুমায়ুন, আকবর মোগল বাদশাদের হুকুমে চলে। মোগলরা এদেশে এসেছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে। তারা শক্ত মাটির উপরে খাড়া পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তিযূথ, উষ্ট্রবাহিনী চতুরঙ্গ সৈন্য-সামন্তের কি প্রয়োজন সে-তত্ত্ব বিলক্ষণ বোঝে, কিন্তু নৌবহর রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। বাঙলা, উড়িষ্যা, গুজরাত থেকে তাদের কাছে অনেক করুণ আবেদন নিবেদন গেল—'হুজুরেরা দয়া করে একটা নৌ-বহরের ব্যবস্থা করুন; না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মানে-ইজ্জতে গেলুম।'

কথাগুলো একদম শব্দার্থে খাঁটি। 'ধন' গেল, কারণ পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে ব্যবসা-বাণিজ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ। 'প্রাণ' যায়, কারণ তারা বন্দরে বন্দরে লুঠ-তরাজের সময় যে-সব খুন-খারাবি করে তারই ফলে বন্দরগুলো উজাড় হতে চললো। মান-ইজ্জত? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্তুগালের হাটবাজারে গোলাম-বাঁদী, দাসদাসীরূপে বিক্রয় করছে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! মোগল বাদশারা বসে আছেন পশ্চিম পানে, খাইবার-পাসের দিকে তাকিয়ে। ঐদিক থেকেই তাঁরা এসেছেন স্বয়ং, তাঁদের পূর্বে এসেছে পাঠান শক্-হূন্-সিথিয়ান্-

এরিয়ান। তাই তাঁরা তৈরী করেছেন চতুরঙ্গ। ওদের ঠেকাবার জন্য। নৌবহর চুলোয় যাক্‌গে। ভারতবর্ষ তো কখনো সমুদ্রপথে পরাজিত এবং অধিকৃত হয়নি। তার জন্য বৃথা দুশ্চিন্তা এবং অযথা অর্থক্ষয় অতিশয় অপ্রয়োজনীয়।

ফলে কি হল? পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ সমুদ্রপথেই মোগলদের মুণ্ডু কেটে এদেশে রাজ্যবিস্তার করলো।

সেকথা পরের কথা। উপস্থিত আমরা আলোচনা করছি, ভারতীয় উপকূলবাসীরা পর্তুগীজদের সঙ্গে যে লড়াই দিয়েছিল তাই নিয়ে। এরা তো মোগলদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেল না, উল্টে যারা লড়ছিল, তাদের সঙ্গে আরম্ভ করলেন শত্রুতা।

গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ বাদশাহ তখন লড়ছিলেন পর্তুগীজ বোম্বেটের সঙ্গে। তার প্রধান কারণ, গুজরাতের সুরট, ব্রউচ (ভৃগু), খম্বাত (Cambay, স্তম্ভপুরী) ভিতর দিয়ে উত্তর-ভারতের যাবতীয় পণ্যবস্তু ইয়োরোপে যেত। সে-ব্যবসা তখন পর্তুগীজ বোম্বেটের অত্যাচারে মর-মর। বাহাদুর শাহ বাদশার তখন দুই শত্রু। একদিকে সমুদ্রপথে পর্তুগীজ, অন্যদিকে স্থলপথে রাজপুত। প্রথম রাজপুতদের হারিয়ে দিয়ে পরে পর্তুগীজদের খতম করার প্ল্যান করে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে করলেন আর্মিস্টিস্—সময়কালীন সন্ধি। তারপর হানা দিলেন রাজপুতানায়।

দিল্লীতে তখন রাজত্ব করেন বাদশা হুমায়ুন। ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছো, তখন এক রাজপুতানী শাহ-ইন্‌-শাহ্‌ দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরকে পাঠালেন রাখী। সেই রাখীর সম্মানার্থে হুমায়ুন ছুটলেন রাজপুতানার দিকে। বুঝলেন না, বাহাদুর শাহ হেরে গেলে পর্তুগীজদের আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। পূর্বেই বলেছি, নৌবহর নৌসাম্রাজ্য বলতে কি বোঝায়, মোগলরা সে-কথা আদপেই বুঝতো না।

হুমায়ুন রাজপুতানায় পৌঁছলেন দেরিতে। বাহাদুর শাহ্‌ বাদশাহ তখন রাজপুতানা জয় করে ফেলেছেন। রাজপুতানীরা

জৌহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হুমায়ুন তখন আক্রমণ করলেন বাহাদুর শাহ্‌কে। বাহাদুর তখন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চম্পানির দুর্গে। সেখানে কি করে হুমায়ুন দুর্গ জয় করলেন, সে কাহিনী অবশ্য ইতিহাসে পড়েছ। ইতিমধ্যে বাহাদুর দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়েছেন গুজরাতে আপন রাজধানী অহমদাবাদের দিকে। হুমায়ুন সেদিকে তাড়া লাগাতে তিনি পালালেন সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ কাঠিয়াওড়ারের দিকে। সেখানকার কোনো কোনো উপকূলে তখন পর্তুগীজরা বেশ পা জমিয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন খবর পেলেন, বিহারের রাজা শের্ শাহ দিল্লী জয় করার উদ্দেশ্যে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তদ্দণ্ডেই তিনি বাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চললেন দিল্লীর দিকে। সেখানে শের শাহের কাছে মার খেয়ে তিনি পালালেন কাবুলে। তারপর শের শাহ ব্যস্ত হয়ে রইলেন, উত্তর-ভারতে আপন প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে। বাহাদুরকে তাড়া দেবার ফুর্সৎ তাঁর নেই। বাহাদুর হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বললেন, 'এইবারে তবে পর্তুগীজ বদমায়েশদের ঠাণ্ডা করি।' পর্তুগীজরা ততদিনে বুঝতে পেরেছে, বাহাদুরের পিছনে তখন আর শত্রু নেই। তাই তারা আরম্ভ করলে তাদের পুরনো বদমায়েশী। বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানালে, তাদের জাহাজে এসে, ব্যবসা-বাণিজ্য সন্ধি-চুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা-পরামর্শ করার জন্য।

বাহাদুর আহাম্মুখের মত কেন গেলেন, সেই নিয়ে বিস্তর ঐতিহাসিক বহু আলোচনা-গবেগণা করেছেন। সে নিয়ে আজ আর আলোচনা করে কোনো লাভ নেই।

তা সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্য, বাহাদুর জাহাজে ওঠা মাত্রই বুঝতে পারলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। পর্তুগীজদের বদ-মতলব তাঁকে খুন করার, তাঁর সঙ্গে সন্ধি-সুলেহ্ করার জন্য নয়। তক্ষুনি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে—সাঁতরে পাড়ে ওঠার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশটা পর্তুগীজও হাতে বৈঠা নিয়ে তাঁর পিছনে

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সব বৈঠে দিয়ে গুজরাতের শাহ-ইন্‌-শাহ্‌ বাদ্‌শাহ্‌ বাহাদুর শাহের মাথা ফাটিয়ে দিলে।

পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এই শেষ লড়াই।

* * * *

কিন্তু আজ সুয়েজ বন্দরে ঢোকার সময় আমি দেশ পানে ফিরে গিয়ে এসব কথা পাড়ছি কেন?

কারণ, এই সুয়েজের রাজাকেই বাহাদুর তখন ডেকেছিলেন তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে এসে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁকে নৌ-সমরে সাহায্য করতে। পূর্বেই বলেছি, সুয়েজও বেশ জানতো, পর্তুগীজদের বোম্বেটেগিরি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কতখানি মারাত্মক। শুধু বাহাদুর নয়, তাঁর পূর্বপুরুষগণও বার বার এঁদের ডেকেছেন, দুয়ে মিলে পর্তুগীজদের একাধিকবার ঝিঙে-পোস্ত চন্দন-বাঁটা করেছেন।

তারা তখন যেসব কামান এনেছিল সেগুলো ফেরত নিয়ে যায়নি। বাহাদুর যখন বললেন, 'এগুলো রেখে যাচ্ছেন কেন?' তখন তারা বলেছিল, 'এই সব পর্তুগীজ বদমায়েশরা আবার কখন হানা দেবে তার ঠিক-ঠিকানা কি? আবার তখন কামান নিয়ে আসার হাঙ্গাম হুজ্জোত ঠেলবার কি প্রয়োজন?'

এ ঘটনার দশ বৎসর পর আকবর গুজরাত জয় করেন। তিনি কামানগুলো দেখে তাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস জেনেও নৌ-বাহিনী নৌ-সমরের মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই পর্তুগীজরা জিতল। তাদের হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ জিতল। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ কলকাতা হয়ে তাবৎ ভারতবর্ষে আপন রাজ্য বিস্তার করলো।

* * * *

আজ সুয়েজে ঢুকে সেই কথাই স্মরণে এল, এই সুয়েজের লোকই একদিন, আমাদের সঙ্গে একজোট হয়ে পর্তুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে কী লড়াই-ই না দিয়েছেন!

সম্বিতে ফিরে এলুম। দেখি, বখেড়া লেগে গিয়েছে। বন্দরে নেমে যে দপ্তরের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেখানে আমাদের— অর্থাৎ আবুল আসফিয়ার দলকে আটকে দিয়েছেন বন্দরের কর্তারা। কেন, কি ব্যাপার? আমাদের হেল্‌থ সার্টিফিকেট কই? সে আবার কি জ্বালা? দিব্য তো বাবা লঞ্চ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এখানে এলুম, স্ট্রেচারে চেপে কিম্বা মড়ার খাটিয়ায় শুয়ে আসিনি; তবে আমাদের হেল্‌থ সম্বন্ধে এত সন্দ কেন? 'উহুঁ', কর্তারা বলছেন, আমরা যে ভিতরে ভিতরে বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, ৎসেৎসে জ্বর (সে আবার কি মশাই?) স্পটেড ফীভর (ততোধিক সমস্যা; আয়না-কাটা জ্বর?) ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক রোগে ভুগছি না তার সার্টিফিকেট কই। আমরা যে এসব পাপিষ্ঠ রোগ তাঁদের সোনার দেশ মিশরে ছড়াবো না, তার কি জিম্মাদারি?

শুনে পার্সি বলছে, 'স্যর, এসব মারাত্মক রোগেই যদি ভুগবো, তবে বাপ-মার সেবাশুশ্রূষা ছেড়ে, পাদ্রীসাহেবের শেষ ধর্মবচন না শুনে এখানে আসবো কেন?'

ত্যাশের লোক প্রতুল সেন বলছে, 'মিশরের সঙ্গে এরকম ধারা দুশমনি আমরা করতে যাবো কেন?'

তার বউ রমা বলছে, 'পিরামিড তোমাদের গৌরবের বস্তু; আমাদের যে-রকম তাজমহল। তার কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বিচারের সুযোগ না দিয়ে আপনারা আপন দেশের প্রতি কি অবিচার করছেন, বুঝতে পারছেন কি?'

আমি কানে কানে রমাকে শুধালুম, 'তবে কুকের সঙ্গে যে সব লোক এসেছিল তারা পেরুল কি করে?'

রমা বললে, 'চুপ করুন; ওরা যে ঐ সব হলদে হলদে কাগজ দেখালে। আমাদেরও আছে। জাহাজে ফেলে এসেছি। আমরা তো জানতুম না এখানে ওসব রাবিশের দরকার হবে। কুকের লোক জানতো, ওরা তাই সার্টিফিকেট এনেছিল।'

ওঃ! তখন মনে পড়লো, পাসপোর্ট নেবার সময় ভ্যাক্সিনেশন্ ইনকুলেশন করিয়েছিলুম বটে এবং ফলে একখানা হলদে রঙের সার্টিফিকেটও পেয়েছিলুম বটে। সেইটে নেই বলেই এখানে এ গর্দিশ।

কিন্তু এ শিরঃপীড়া তো আমাদের নয়। আবুল আসফিয়া যখন আমাদের দলের নেতা তখন তাঁরই তো বোঝা উচিত ছিল যে ঐ ম্যাটমেটে হলদে রঙের কাগজটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞান যার নেই—

চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। দেখি, পল আমার হাত টানছে, আর কানে কানে বলছে, 'চলুন, জাহাজে ফিরে যাই।'

কিন্তু আবুল আসফিয়া কোথায়?

তিনি দেখি নিশ্চিন্ত মনে, একে সিগরেট দিচ্ছেন, ওকে টফি খাওয়াচ্ছেন, তাকে চকলেট গেলাচ্ছেন। কোলে আবার একটা বাচ্চা! খোদায় মালুম কার?

লোকটা তাহলে বদ্ধ পাগল! পাগলের সংস্পর্শ ত্যাগ করাই ধর্মাদেশ।

পলের হাত ধরে পোর্ট-আপিস ছেড়ে সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছলুম। তখন দেখি আমাদের জাহাজ ভোঁ-ভোঁ করে গুরুগম্ভীর নিনাদে সুয়েজ খালে ঢুকে গিয়েছে।

দেশ ভ্রমণ আমি বিস্তর করেছি। সামান্য কিছু ঘটতে না ঘটতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়িনে। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে চা খেতে গিয়েছি, ওদিকে গাড়ি আমার বাক্স-তোরঙ্গ বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে গিয়েছে, বিদেশে-বিভূঁইয়ে মণি-ব্যাগ চুরি যাওয়াতে আমি কপর্দক হীন, ইতালির এক রেস্তোরাঁয় দুই দলে ছোরা-ছুরি হচ্ছে—আমি নিরীহ বাঙালী এক কোণে দেয়ালের চুণকামের মত হয়ে গিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছি—এ সব ঘটনা আমার জীবনে একাধিক বার ঘটেছে। কিন্তু এবার সুয়েজ বন্দরে, আবুল আসফিয়ার পাল্লায় পড়ে যে বিপদে পড়লুম তার সঙ্গে অন্য কোনো গর্দিশের তুলনা হয় না।

আমাদের জাহাজ তার আপন পথে চলে গিয়েছে। আমরা এখানে আটকা পড়েছি হেল্‌থ সার্টিফিকেট নেই বলে। তা হলে এখানকার কোনো হোটেলে উঠতে হয় এবং প্রতি জাহাজে ধন্না দিতে হয়, আমাদের জায়গা দেবে কি না। খুব সম্ভব দেবে না। কারণ সেই পোড়ারমুখো হেল্‌থ সার্টিফিকেট না থাকলে জাহাজেও উঠতে দেয় না। এস্থলে 'জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ' নয়, এখানে 'জলে সাপ, ডাঙায়ও সাপ।'

জাপানী আক্রমণের সময় একটা গাঁইয়া গান শুনেছিলুম,

সা রে গা মা পা ধা নি
বোমা পড়ে জাপানী
বোমা-ভরা কালো সাপ
ব্রিটিশে কয় 'বাপ রে, বাপ!'

তাই মনে হল জাপানীরা যেন জলে ডাঙায়, উভয়তঃ হেল্‌থ সার্টিফিকেটের সাপ ফেলে গেছে।

আর ডাঙার হোটেলে থাকতে দেবেই বা কদিন? আমাদের ট্যাঁকে যা কড়ি তার খবর হোটেলওলা ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পেরে নিশ্চয়ই আমাদের 'দূর্দ্দুর' করে তাড়িয়ে দেবে। তখন যাবো কোথায়, খাবো কি? তখন অবস্থা হবে সুয়েজ বন্দরের ধনী-গরীব সকলের কাছে ভিখ মাঙবার। কিন্তু কেউ কিছু দেবে কি? রেল-ইষ্টিশানে যখন কেউ এসে বলে, 'মশাই, মনিব্যাগ চুরি গিয়েছে; চার গণ্ডা পয়সা দিন, বাড়ির ইষ্টিশানে যেতে পারবো,' তখন কি কেউ শোনা মাত্রই পয়সা ঢালে?

ইয়া আল্লা, এ কোথায় ফেললে, বাবা? এ যেন অকূল সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপবাস।

মানুষ যখন ভেবে ভেবে কোনো কিছুর কূল-কিনারা করতে পারে না তখন অন্যের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে। পল-পার্সিকে নিয়ে ফিরে গেলুম আবুল আসফিয়ার কাছে।

তিনি দেখি ঠিক সেই মুহূর্তেই পোর্ট-অফিসারকে শুধাচ্ছেন, 'তা হলে হেল্‌থ সার্টিফিকেট কোথায় পাওয়া যায়?

এ যেন পাগলের প্রশ্ন! হেলথ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যায় আপন দেশে; এখানে পাবো কি করে?

তাই আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না যখন অফিসার বললেন, 'কেন ঐ তো পাশের দফ্‌তরে।'

তাহলে এতক্ষণ ধরে এ-সব টানা-হ্যাঁচড়ার কি ছিল প্রয়োজন? ভালো করে শোনার পূর্বেই আমরা সব কটা প্রাণী ছুট দিলুম সেই দফ্‌তরের দিকে। জলের সাপ, ডাঙার সাপ, সা-রে-গা-মার জাপানী সাপ সব কটা তখন এক জোটে যেন আমাদের তাড়া লাগিয়েছে।

দফ্‌তরের দরওয়াজা খোলাই ছিল। দেখি, এক বিরাট-বপু ভদ্রলোক ছোট্ট একখানা চেয়ারে তাঁর বিশাল কলেবর গুঁজে-পুরে

টেবিলের উপর পা দু-খানি তুলে ঘুমুচ্ছেন। আমরা অট্টরোল করে না ঢুকলে নিশ্চয়ই তাঁর নাকের ফরফরানি শুনতে পেতুম। আমাদের, 'হেল্‌থ সার্টিফিকেট', 'হেল্‌থ সার্টিফিকেট', 'প্লীজ' 'প্লীজ' এই উৎকট সমবেত সঙ্গীতে—অবশ্য ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, যার এক সপ্তকে বাজে তোড়ী অন্য সপ্তকে পূরবী—ভদ্রলোক চেয়ার-সুদ্ধ লাফ মেরে উঠলেন।

শতকরা নিরানব্বুই জন যাত্রী হেল্‌থ সার্টিফিকেট নিয়ে বন্দরে নামে। সুতরাং এ ভদ্রলোকের শতকরা নিরানব্বুই ঘণ্টাই কাটে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। তাই আমরা কি বেদনায় কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসেছি, সেটা বুঝতে তাঁর বেশ একটু সময় লাগল।

তাঁর ভাষা আমরা বুঝিনে, তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন না। তৎসত্ত্বেও যে মারাত্মক দুঃসংবাদ তিনি দিলেন তার সরল প্রাঞ্জল অর্থ, যে-ডাক্তার আমাদের পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেবেন তিনি বাড়ি চলে গেছেন।

গোটা সাতেক ভাষায় তখন যে আর্তরব উঠলো তাকে বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,—

ঐ যা-যা!

ফরাসীরা বলেছিল, 'মঁ দিয়ো, মঁ দিয়ো!'

জর্মনরা বলেছিল, 'হের গট্, হের গট্!'

ইরানিরা বলেছিল, 'ইয়াল্লা, ইয়া খুদা!'

আর কে কি বলেছিল, মনে নেই।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণা, আল্লাতালার বেহদ্ মেহেরবানি, রাখে কেষ্ট মারে কে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, শুনি অপিসার বলছেন, 'কিন্তু আপনারা যখন বহাল তবিয়তে, দিব্য ঘোরা-ফেরা করছেন, তখন আপনারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান। সার্টিফিকেট আমিই দেব। এই নিন ফর্ম। ফিল্ অপ্ করুন।' বলেই এক-তাড়া বিশ্রী নোংরা বাদামী ফরম আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে

হল আহা কী সুন্দর। যেন ইস্কুলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট, আর সব ক-টাতে লেখা আছে আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি।

শকুনির পাল যে রকম মড়ার উপর পড়ে, আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লুম সেই 'গাজী মিয়ার বস্তানির' উপর। উহুঁ, ভুল উপমা হল, বীভৎস রসের উপমা দিতে অলঙ্কারিকরা বারণ করেছেন। তাহলে বলি, ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দেবার অধিকার পেলে মা যে রকম নাকচের ফর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উৎসাহে, উত্তেজনায় আমাদের সব্বাইকার মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফর্মে প্রশ্ন, 'কোন সালে তোমার জন্ম?' কিছুতেই মনে পড়ছে না, ১৮০৪—না ১৭০৪? প্রশ্ন, 'কোন বন্দরে জাহাজ ধরেছে?' বেবাক ভুলে গিয়েছি, হংকং না তিব্বত। প্রশ্ন, 'যাবে কোথায়?' হায়, হায়, টাকের বাকি আড়াই গাছা চুল ছিঁড়ে ফেললুম, তবু কিছুতেই মনে পড়ছে না, শনিগ্রহে না ধ্রুবতারায়।

তা সে যাক্‌গে, আমরা কি লিখেছিলুম। তাই নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরে জানলুম, সেই সহৃদয় অপিসারটি ইংরিজি পড়তে পারেন না।

ঝপাঝপ বেগনি ষ্ট্যাম্প মেরে তিনি আমাদের গণ্ডা আড়াই সার্টি-কেট ঝেড়ে দিলেন। আমরা সেগুলো বসরাই গোলাপের মত বুকে গুঁজে খোলা-খোঁয়াড়ের গোরুর মত বন্দরের অপিস থেকে সুস্‌সুড় করে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলুম। এখন আমরা ইচ্ছে করলে কেপ্‌ কম্‌রিন যেতে পারি, ইচ্ছে না করলে কোথাও যাবো না।

পল বললে, 'স্যর, কি লিখতে কি লিখেছি, কিচ্ছুটি জানিনে।'

আমি বললুম, 'কিচ্ছু পরোয়া করো না, ভাই! আম্মো তদবৎ!'

ফরাসী রমণী হেসে বললেন, 'মসিয়ো পল, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতো, তুমি বকরী না মানুষ? তা হলে আমি প্রথম খানিকটে ব্যা ব্যা করে নিতুম তার পর আপন মনে খানিকটে ফরাসী বলে

—আমরা যেন স্বপ্নে চলেছি—

হঠাৎ দেখি, আমরা স্বাধীন।

এ বই ছোটদের জন্য লেখা। তারা হয়তো শুধবে, মৃত্যুর কথা তাদের শোনাচ্ছি কেন? আমার মনে হয়, শোনানো উচিত। সাধারণত বড়রা ছোটদের যত আহাম্মুখ মনে করেন আমি বুড়ো হয়েও সে রকম ভাবিনে।

আমার যখন বয়স তেরো, তখন আমার সব চেয়ে ছোট ভাই বছর দুয়েক বয়সে মারা যায়। ভারী সুন্দর ছেলে ছিল সে। আমার কোলে বসতে বড্ড ভালোবাসত। ঐ দু বছর বয়সে সে আমার সাইকেলের রডে বসে হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরে থাকতো আর আমি বাড়ির লনে পাক লাগাতুম। মাঝে মাঝে সে খল-খল করে হেসে উঠতো আর মা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে খুশী হয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন কিন্তু মাঝে মাঝে বলতেন, 'থাক্, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

এক দিন সে চলে গেল।

আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছিলুম।

তখন আমায় কেউ বুঝিয়ে বলেনি, মৃত্যু কাকে বলে? তার অর্থ যদি আমাকে তখন কেউ বুঝিয়ে বলতো তবে বেদনা লাঘব হতো।

বড়রা ভাবেন, ছোটদের বেদনাবোধ কম। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তোমরা যারা আমার বই পড়ছো, তোমাদের কেউই কি ভাই-বোন হারাও নি? সে বুঝবে।

কবিগুরুর ছোট ভাই-বোন ছিলেন না। তাই বিস্ময় মানি, তিনি কি করে লিখলেন,—

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চলে
যায় কোথা সেই স্বর্গপারে।

বল্ তো কাকী
সত্যি তা কি একেবারে ?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,
দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।
বাবা গেছেন এমনি করে
কখন ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।
তেমনি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে।*

এই কাকাটি সত্যই ছোট ছেলের বেদনা বুঝতেন।

কিন্তু মূল কথা থেকে কত দূরে এসে পড়েছি। তাই মৃত্যু সম্বন্ধে শেষ কথা বলে মূল কথায় ফিরে যাই। ভগবানে আমার অবিচল বিশ্বাস। তাই আমি জানি, আমি যখন মরণের সিংহদ্বার পার হব তখন দেখব, বাবা, ঠাকুরদা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা, আরো কত শত উর্ধ্ব-পুরুষ সৌম্যবদনে এগিয়ে আসছেন, আমাকে তাঁদের মাঝখানে বরণ করে নেবার জন্য। এবং জানি, জানি, নিশ্চয় জানি, তাঁদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে, আমার মা আমার ছোট ভাইকে হাসিমুখে কোলে নিয়ে। তার চেয়েও আশ্চর্য বোধ হয়, যখন মনের চোখে ছবি দেখি, আমার এই ছোট ভাই, একদা টলটলায়মান পায়ে আমার মায়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তাঁকে আপনজনের মধ্যে নিয়ে যাবার

*শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১০৮ পৃঃ

জন্য, তার কোলে ওঠার জন্য। সে তো ও-লোকে গিয়েছিল মায়ের বহু পূর্বে।

আমি যখন সে-লোকে যাবো তখন ভগবান শুধাবেন, 'তুমি কি চাও?' আমি তৎক্ষণাৎ বলবো, 'একখানা বাইসিকেল।' পাওয়া-মাত্রই তাতে ভাইকে রডে চড়িয়ে স্বর্গের লনে চক্কর লাগাবো। সে খল-খল করে হাসবে। মা দেখবে, কিন্তু কক্‌খনো বলবে না, 'থাক্, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।'

* * * *

অতএব সব বিপদ থেকেই নিষ্কৃতি আছে। গাড়ি গেছে তো গেছে তাতে ভয় পাবার অত কি?

দেখি, আবুল আস্‌ফিয়া নেই।

আমাদের এই অকূল সমুদ্র আর অন্তহীন মরুভূমির মাঝখানে ফেলে দিয়ে লোকটা পালালো না কি?

স্টেশনের বাইরে তাঁর খোঁজ করতে এসে দেখি, তিনি এক জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রসালাপ আরম্ভ করেছেন। অনুমান করলুম তিনি ট্যাক্‌সি-যোগে কাইরো পৌঁছবার চেষ্টাতে আছেন।

কিন্তু ট্যাক্‌সিওলারা আমাদের মজ্জমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছে এবং যা দর হাঁকছে তা দিয়ে দুখানি নূতন ট্যাক্‌সি কেনা যায়।

আবুল আস্‌ফিয়া তাকে বহুতর ধর্মের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেন, ততোধিক ভারত মিশরীয় মৈত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন এবং সর্বশেষে তিনি মুসলমান সেও মুসলমান, সে-সত্যের দোহাই-কসম খেলেন কিন্তু ট্যাক্‌সিওলাটি ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে খাঁটি দুর্যোধন। বিনা যুদ্ধে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি এগোবে না।

আবুল অস্‌ফিয়ার চোখে-মুখে কিন্তু কোনো উষ্মার লক্ষ্মণ নেই। ভৃগু-পদাহত তিতিক্ষু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি তখন চললেন হেল্‌থ আফিসের দিকে। আমিও পিছু নিলুম।

সেই বিরাট-বপু ভদ্রলোক, যিনি আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রথম ফাঁড়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবারে তাঁকে জাগাতে গিয়ে আবুল আস্‌ফিয়াকে রীতিমত বেগ পেতে হল।

তাঁকে তখন তিনি যা বললেন, তার সরল অর্থ, তিনি ডাকাতকে ডরান না, ডাকাত বন্দুক উঁচালে তিনিও বন্দুক তুলতে জানেন, কিন্তু এরকম বন্দুকহীন ডাকাতির বিরুদ্ধে লড়বার মত হাতিয়ার তো তাঁর নেই। অবশ্য তিনি ঘাবড়ান নি, কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই ; তবে কি না অফিসারটি যদি একটু সাহায্য করেন, তবে আমাদের উপকার হয়, তাঁরও পুণ্য হয়।

অফিসার বললেন, 'চলুন'।

তিনি ট্যাক্‌সিওলাদের সঙ্গে দু-চারটি কথা বলেই আমাদের জানালেন কত দিতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল, গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে যা লাগতো, ট্যাক্‌সিতে তাই লাগবে। আমরা তাতেই খুশী। কাইরো তো পৌঁছব, পোর্টসঈদে তো জাহাজ ধরতে পারবো, তবে আর ভাবনা কি ?

আমরা হুড়মুড় করে দুখানা ট্যাক্‌সিতে কাঁটাল বোঝাই হয়ে গেলুম।

আমি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঠার সময় বললুম, 'আপনি আমাদের জন্য এতখানি করলেন। সত্যিই আপনার দয়ার শরীর।'

তিনি ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে যা বললেন, তা শুনে আমি অবাক। তার অর্থ, তাঁর শরীর আদপেই দয়ার শরীর নয়। তিনি কিছুমাত্র পরোপকার করেন নি। আমরা এক পাল ভিখিরী যদি সুয়েজ বন্দরে আট্‌কা পড়ে যাই তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই ঘাড়ে পড়বো। আমাদের তাড়াতে পেরে তিনি বেঁচে গেছেন—ইত্যাদি।

আমি আপত্তি জানিয়ে মোটরে বসে ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা কি—বহু দিন পূর্বেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁর দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার এক চিত্রকর বন্ধু, বিনোদবিহারী এক দিন তাঁর দূরবীনটি ধার নিলে—বেচারী চোখে দেখতে পেত কম। কয়েক দিন পরে সেটা ফেরত দিতে গেলে দিনুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম দেখলে ?'

'আজ্ঞে, চমৎকার!' বিনোদ এত দূরের জিনিস এর আগে কখনো দেখতে পায় নি।

'তবে ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। লোকে বড্ড জ্বালাতন করে। আজ এটা এ চায়, কাল ওটা ও চায়, পরশু ওটা সে চায়। আমি পেরে উঠিনে। তোমার কাছেই ওটা থাক্।'

বিনোদ একাধিকবার চেষ্টা করেও সে দূরবীন ফেরত দিতে পারে নি।

এই হল খানদানী লোকের পরোপকার করার পদ্ধতি। সে দেখায়, যেন সে আদপেই পরোপকার করে নি। নিতান্ত নিজের মঙ্গলের জন্য, আড়াগোড়া সে স্বার্থপরের মত কাজ করেছে।

বুঝলুম, এ অফিসারটিও দিনুবাবুর স্বগোত্র। ইচ্ছে করেই 'স্বগোত্র' শব্দটি ব্যবহার করলুম; আমার বিশ্বাস, ইহ-সংসারের যাবতীয় ভদ্রলোক একই গোত্রের—তা তাঁরা ব্রাহ্মণ হন আর চণ্ডাল হন, হিন্দু হন আর মুসলমান হন, কাফ্রী হন আর নর্ডিক হন।

ততক্ষণে আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতি যে রকম আবছায়া-আবছায়া হতে থাকে।

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সে দৃশ্য বাঙলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। তবে যদি কখনো পদ্মার বিরাট বালুচড়ায় পূর্ণিমা-রাতে বেড়াতে যাও— রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং 'নিশীথে' গল্প তারি পটভূমিতে লেখা —তাহলে তার খানিকটে আস্বাদ পাবে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভূতুড়ে বলে মনে হয়। চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন ঝাপ্‌সা আবছায়ার পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক ঠিক দেখতে পারছিনে, চিনতে পারছি তবু ঠিক ঠিক চিনতে পারছিনে। চতুর্দিক ফটফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপছে পড়ে; মনে হয় এ-আলোতে অক্লেশে খবরের কাগজ পড়া যায়, অথচ এ আলোতে লাল কালোর তফাৎ যেন ঘুচতে চায় না। মেঘলা দিনে এর চেয়ে অনেক ক্ষীণালোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশী ধরা পড়ে।

তাই,

মনে হ'ল পাখি, মনে হল মেঘ, মনে হল কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হ'ল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল?

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু-মাথা উঁচুতে ফুটে ওঠে, জ্বল-জ্বল দুটি ছোট সবুজ আলো; ওগুলো কি? ভূতের চোখ নাকি? শুনেছি ভূতের চোখই সবুজ রঙের হয়। নাঃ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান—এদেশের ভাষাতে যাকে বলে

'কাফেলা' (কবি নজরুল ইসলাম এ শব্দটি বাঙলায় ব্যবহার করেছেন)। উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখ ছুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। দেশে গোরু-বলদের চোখে আলো পড়ে ঠিক এই রকমই হয়, কিন্তু বলদের চোখ যে লেভেলে দেখি উটের চোখ তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই পাবো না বলো? জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছো, রাত্রি বেলা—আবার বলছি, রাত্রিবেলা। মরুভূমি সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইঁন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, সেখান থেকে উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তৃষ্ণায় মতিছন্ন হয়ে গিয়ে সে হঠাৎ কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সূর্যের দিকে জিভ দেখিয়ে দেখিয়ে নাচে আর শুষ্ককণ্ঠে বীভৎস গলায় গান জোড়ে,

তুই আমার কি করতে পারিস তুই ক্যা রে?

তুই—(অশ্লীলবাক্য)—তুই ক্যা রে?

এবং তার চেয়েও বদ্‌খদ্ বেতালা 'পদ্য'।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সন্ধ্যে অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ি রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয়নি; তখন কি হবে উপায়?

কিন্তু করুণাময়কে অসীম ধন্যবাদ; পল-পার্সি দেখলুম অন্য ধরনের ছেলে। তারা সেই জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিন্‌হ ধাবহি (তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে বানরদের কলরোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ট'-এর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন) শব্দ ছাপিয়ে বিকটতর কটকট করছে। তাদের কী আনন্দ!

পল ঃ 'সব-কিছু ভালো করে দেখে নে ; মাকে যাবতীয় জিনিস যেন গুছিয়ে লিখতে পারি।'

পার্সি ঃ 'তোর জীবনে এই তুই প্রথম একটা খাঁটি কথা কইলি। কোনো জিনিস যেন বাদ না পড়ে। ওঃ, মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কল্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকটে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চড়ে যাবো?'

পল ঃ 'ঠিক বলেছিস্। আর মা-বাবা কী রকম আশ্চর্য হবেন, ভাব দিকিনি! কিন্তু, ভাই, ওনরা যদি তখন ধমক দেন, জাহাজ ছেড়ে তোমরা এ রকম বাউণ্ডুলীপনা করতে গিয়েছিলে কেন? তখন?'

পার্সি বললে ঃ 'ঐ তো তোর দোষ! সমস্তক্ষণ ভয়ে মরিস। তখন কি আর একটা সদুত্তর খুঁজে পাবো না? ঐ স্যার রয়েছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না। উনি কি বলেন।'

আমি বললুম ঃ 'দোষ দেবেন, তো তখন দেবেন। এখন সে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবার জিনিস অবহেলা করবে না কি? বিশেষত, যদি আমাদের অভিযান অন্যায় কর্মই হয়ে থাকে, সেটাকে যখন রদ করার শক্তি আমাদের হাতে নেই।'

পার্সি বললে ঃ 'আর ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? আমাদের জাহাজ তো অনেকক্ষণ হল ছেড়ে দিয়েছে।'

চালাক ছেলে ; সবদিকে খেয়াল রাখে।

মরুভূমিতে দিনের বেলা যে-রকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও ঠিক তেমনি বিকট শীত। বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু ধোপে সেটা কতখানি টেকে আমি যাচাই না করে বলতে পারবো না। উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়মাস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল ; ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাঙ্গ যেন জলে-ভেজা জুঁই ফুলের মত ফুলে উঠলো।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

পেশাওয়ার, জলালাবাদের ১২০।১২২ ডিগ্রী সওয়ার পর আমি খাক্-ই-জব্বারের ৬০ ডিগ্রীতে পৌঁছতে কী আরাম অনুভব করেছিলুম সে অন্যত্র বর্ণনা করেছি। কোথায়? উঁহু, সেটি হচ্ছে না। বললেই বলবে, আমি সুযোগ পেয়ে আমার অন্য বইয়ের বিজ্ঞাপন এখানে নিখর্চায় চালিয়ে দিচ্ছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই, যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙলো তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কাইরো পৌঁছে গিয়েছি। গাড়ির আর সবাই তখনো ঘুমচ্ছে। আমার সন্দেহ হল ড্রাইভারও বোধ করি ঘুমচ্ছে। গাড়ি আপন মনে বাড়ির দিকে চলেছে; সোয়ার ঘুমিয়ে পড়লেও ঘোড়া যে রকম আপন বাড়ি খুঁজে নেয়।

পার্সিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললুম: 'তবে না, বৎস, বলেছিলে, মরুভূমির সব টুকিটাকি পর্যন্ত মনের নোট বুকে টুকে নেবে?' যেন আমি নিজে কতই না জেগে ছিলুম।

পার্সিও তালেবর ছেলে। তখখুনি দিলে পলের কানে ধরে একখানা আড়াই-গজী টান। আমি পার্সিকে যা বলেছিলুম সে পলকে তাই শুনিয়ে দিলে। পল বেচারী আর কি করে? সে আস্তে আস্তে মাদমোয়াজেল শেনিয়েকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'কাইরো পৌঁছে গিয়েছি।'

বাঙাল দেশে কথায় কয়—পশ্চিম বাঙলায় বলে কি না জানিনে—'সায়েব বিবিকে মারলেন চড়, বিবি বাঁদীকে দিলেন ঠ্যাঙ্গা, বাঁদী বেরালকে মারলে লাথি, বেরাল খামছে দিলে নুনের ছালাটাকে।'

সংসারে এই রীতি।

এখানে অবশ্য প্রবাদ টায়টায় মিলল না। তাই পল অতি সবিনয়ে মেমসাহেবকে জাগিয়ে দিলে।

মাদমোয়াজেল হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পাউডার বের করে নাকে ঘষতে ঘষতে ফরাসীতে শুধালেন, আমার বিশ্বাস ফরাসিনীরা ঘুমন্ত

অবস্থায়ও ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে পারেন এবং লাগান—'আমরা কোথায় পৌঁছলুম, মসিয়ো ?'

'ল্যা ক্যার'।

পল বেশ খানিকটে ফরাসী জানতো। আমাকে শুধালে : 'ল্যা ক্যার' অর্থ হল 'দি কাইরো'। 'ল্যা'টা আবার পুংলিঙ্গ। একটা শহরের আবার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ কি করে হয় ?'

আমি বললুম : 'অত বিদ্যে আমার নেই, বাপু! তবে এইটুকু জানি এ-বাবদে ফরাসীই একমাত্র আসামী নয়। ব্রহ্মপুত্রকে বলি নদ, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ এবং গঙ্গাকে বলি নদী, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। কেন বলি জানিনে।

পার্সি বললে : 'আমরা ইংরেজরাই বা জাহাজকে 'শী' অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ দিয়েছি কেন ?'

আমি বললুম : 'উপস্থিত এ আলোচনা অক্‌স্‌ফোর্ডের জন্য মুলতুবী রেখে দাও—সেখানেই তো পড়তে যাচ্ছো—এবং নিশির কাইরোর সৌন্দর্যটি উপভোগ করে নাও।'

সত্যি, এরকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পৌঁছই তখন মাঝখানে ঘন বসতি আর বিস্তর জোরালো বাতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিকমত উপলব্ধি করিতে পারিনে। এখানে মরুভূমি পেরিয়ে হঠাৎ শহর বলে একসঙ্গে সব কটা আলো চোখে পড়ে এক অদ্ভুত মরীচিকার সৃষ্টি করে।

ছ-তলা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না—দেখি, লাল আলোতে জ্বালানো শেলাইয়ের কলের ছুঁচ ঘন ঘন উঠছে নামছে, আর সবুজ আলোর চাকা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই যাচ্ছে। নিচে এক বিলিতি কোম্পানীর নাম। আমার মনে হল, হায়! কলটার নাম যদি 'উষা' হত। সেদিন আসবে যেদিন ভারতীয়— যাক্‌গে।

আরো কত রকমের প্রজ্জ্বলিত বিজ্ঞাপন। এ বিষয় কলকাতা কাইরোর বহু পিছনে।

করে করে শহরতলীতে ঢুকলুম। কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয়। কাইরোর সব চোখ খোলা—অর্থাৎ খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তার কথা বাদ দাও। এই শহরতলীতেই কত না রেস্তোরাঁ, কত না 'কাফে' খোলা ; খদ্দেরে খদ্দেরে গিসগিস করছে। (আমাদের যে রকম চায়ের দোকান, মিশরীদের তেমনি 'কাফে' অর্থাৎ কফির দোকান! আমি প্রায়ই ভাবি কফির দোকান যদি 'কাফে' হতে পারে তবে চায়ের দোকান 'চাফে' হয় না কেন ? 'চলো, ভাই, চাফেতে যাই বলতে কি দোষ ?')

আবার বলছি রাত তখন এগারোটা আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখেছি, কিন্তু কাইরোর মত নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়েনি।

কাইরোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম-ম করছে। মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাট্টি খেয়ে যাই। অবশ্য রেস্তোরাঁগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানেরই মত নোংরা। তাতে কি যায়-আসে ? কে যেন বলেছে, 'নোংরা রেস্তোরাঁতেই রান্না হয় ভালো ; কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না ?'

আমার খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ঐসব সায়েব-মেমরা যখন রয়েছেন। তাঁরা 'মঁ দিয়ো', 'হ্যার গ্যট' কি যে বলবেন তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

আচম্বিতে দু-খানা গাড়িই দাঁড়ালো। বসে বসে সবাই অসাড় হয়ে গিয়েছি। সব্বাই নেমে পড়লুম। সক্কলেরই মনে এক কামনা। আড়ামোড়া দিয়ে নি, পা দুটো চালিয়ে নি, হাত দুখানা ঘুরিয়ে নি।

এমন সময় আবুল আসফিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মাথা

পিছনের দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে, হাত দুখানা সামনের দিকে সম্প্রসারিত করে, পোলিটিশিয়নদের কায়দায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কী লেক্‌চার ঝাড়তে আরম্ভ করলেন কিন্তু ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে,—

'মেদাম, মেদমোয়াজেল, এ মেসিয়ো'—

(ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্রকুমারীগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ)

আমরা সকলেই এক্ষণে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধাতুর। নগরী প্রবেশ করতঃ আমরা প্রথমেই উত্তম কিম্বা মধ্যম শ্রেণীর ভোজনালয়ে আহারাদি সমাপন করবো। কিন্তু প্রশ্ন, সেখানে খেতে দেবে কি ? জাহাজে যা দেয় তা-ই। সেই বিস্বাদ সুপ, বিস্বাদতর ষ্টু, তদিতর পুডিং। অর্থাৎ সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিম্বা অ্যাংলো-ইজিপ্‌শিয়ন—যাই বলুন—রস-কষহীন খানা।

পক্ষান্তরে, এই শহরতলীতে যদি আমরা কিঞ্চিৎ আদিম এবং অকৃত্রিম মিশরীয় খাদ্য, মিশরীয় পদ্ধতিতে সুপক্ক খাদ্য ভোজন করি তবে কি এক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না ?'

আমরা কিছু বলার পূর্বেই তিনি হাত দুখানা গুটিয়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন : 'অতি অবশ্য, রেস্তোরাঁগুলো নোংরা। চেয়ার-টেবিল সাফ সুৎরো নয়, কিন্তু মেদাম, মেদমোয়াজেল, মেসিয়ো, আমরা তো আর টেবিল-চেয়ার খেতে যাচ্ছিনে। আমরা খেতে যাচ্ছি খানা। জাহাজের রান্না যখন আমাদের খুন করতে পারেনি, তখন এ রান্নাই বা করবে কি করে ? আপনারাই বলুন।'

কেউ কিছু বলার পূর্বেই পার্সি চেঁচিয়ে উঠলে : 'অফ্‌কোস্‌, অফ্‌কোস্‌—আলবৎ, আলবৎ, আমরা নিশ্চয়ই যাব। আমরা যখন মিশরীয় হাওয়াতেই শ্বাস নিচ্ছি, মিশরীয় জলই খাব, তখন মিশরীয় খাদ্য খাবো না কেন ?'

মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বললেন : 'যাঁরা খেতে চান না, তাঁরা খাবেন না। আমি যাচ্ছি।'

আর আমি বুঝলুম, ফরাসীদেশটা কতখানি স্বাধীনতার দেশ। স্বাধীনতা ফরাসীদের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায়।

শেনিয়ে ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ডেলিকেট প্রাণী। জাহাজের রান্না তাঁর পছন্দসই ছিল না বলে তিনি টোষ্ট, দুধ, ডিম, মটর, কপি, আলুসেদ্ধ খেয়ে প্রাণ ধারণ করতেন। তিনি যখন রাজী তখন—?

আমার মনে হয়, আমরা যে তখন সবাই নিকটতম রেস্তোরাঁয় হুড়মুড় করে ঢুকলুম তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মাদমোয়াজেল ঢুকতে প্রস্তুত, আমার মনে হয়, আর সবাইও তখন মিশরী খানার এক্সপেরিমেণ্ট করবার জন্য তৈরী। এবং সর্বোত্তম কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর! কোথায় কোন্ খানদানী রেস্তোরাঁয় কখন পৌঁছব তার কি ঠিক ঠিকানা! সেখানে হয়তো এতক্ষণে সব মাল কাবার। খেতে হবে মাখন-রুটি, দিতে হবে মুর্গী-মটনের দর। তার চেয়ে ভর ভর খুশবাইয়ের খাবারই প্রশস্ততর। হাতের কাছে যা পাচ্ছি, তাই ভালো সেই নিয়ে আমি খুশী।

রবি ঠাকুর বলেছে,

'কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে?'

ইরানী কবি ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

'Oh, take the Cash, and let the Credit go,
Nor heed the rumble of a distant Drum!

কান্তি ঘোষ তার বাঙলা অনুবাদ করেছেন,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক,
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক!

*　　*　　*　　*

রেস্তোরাঁওলা ছুটে এসে আমাদের আদর কদর করে অভ্যর্থনা (ইসতিকবাল) জানালে। তার 'বয়-রা' বত্রিশখানা দাঁতের মূলো

দেখিয়ে আকর্ণ হাসলে। তড়িঘড়ি তিনখানা ছোট ছোট টেবিল একজোড় করে, চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসাবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবুর্চী ছুটে এসে তোয়ালে কাঁধে বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালে। বসতে গিয়ে দেখি, শ্যামবাজারের সেই লোহার চেয়ার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বসতে গেলে ছ্যাঁকা দেয়।

আমি তখন আমার অভিজ্ঞতা গিলছি। অর্থাৎ দেখছি, বয়গুলোর কী সুন্দর দাঁত! এরকম ত্বধের মত সুন্দর দাঁত হয় কি করে? সে দাঁতের সামনে এরকম রক্তকরবীর মত রাঙা ঠোঁট এরা পেল কোথা থেকে? এবং ঠোঁটের সীমান্ত থেকেই সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে কী অদ্ভুত এক নবীন রঙ! এ রঙ আমার দেশের শ্যামল নয়, এ যেন কি এক ব্রোঞ্জ রঙ! কী মসৃণ কী সুন্দর!

কিন্তু সর্বাধিক মনোরম বাবুর্চীর ভুঁড়িটা। ওঃ! কী বিশাল, কী বিপুল, কী জাঁদরেল!

তার থেকেই অনুমান করলুম আমরা ভালো রেস্তোরাঁতেই ঢুকেছি।

ইতিমধ্যে আবুল আসফিয়া এবং মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বাবুর্চীকে নিয়ে খুদ রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন, আহারাদির বাছাই-তদারক করতে এবং গোটাচারেক ছোকরা এসে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে চেঁচাচ্ছে, 'বুৎ বালিশ, বুৎ বালিশ!'

সে আবার কী যন্ত্রণা?!?!

বুঝতে বেশীক্ষণ সময় লাগলো না; কারণ এদের সকলের হাতে কাঠের বাক্স আর গোটা ত্বই করে বুরুষ। ততক্ষণে আবার মনে মনে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করে বুঝে নিয়েছি, আরবীতে 'ট' নেই বলে 'বুট' হয়ে গিয়েছ 'বুৎ' এবং 'প' নেই বলে 'পলিশ' হয়ে গিছে 'বালিশ'—একুনে দাঁড়ালো 'বুৎ বালিশ'! তাই আরবরা পণ্ডিত জওয়াহরলালের নাম উচ্চারণ করে 'বান্দিৎ জওয়াহরলাল!'

ভাগ্যিস আরবী ভাষায় 'ট' নেই। থাকলে নিরীহ 'পণ্ডিত' আরবিস্থানের 'ব্যাণ্ডিট' হয়ে যেতেন! আদন অঞ্চলের আরবীতে আবার 'গ' নেই; তাই তারা 'গান্ধীর' নাম উচ্চারণ করে 'জান্দী'। অবশ্য সেটা কিছু মন্দ নয়,—সত্যের জন্য 'জান দি' বলেই তো তিনি প্রাণ দান করে দেহত্যাগ করলেন।

বাঙালী তেড়ি কাটাতে ব্যস্ত, ইংরেজ সমস্তক্ষণ টাইটা ঠিক গলার মাঝখানে আছে 'কিনা তার তদারকিতে ব্যস্ত, শিখেরা পাগড়ী বাঁধাতে ঘণ্টাখানেক সময় নেয়, কাবুলীরা হামেহাল জুতোতে পেরেক ঠোকাতে ব্যতিব্যস্ত, আর কাইরোবাসীরা দেখলুম, 'বুৎ বালিশের' নেশাতে মশগুল। তা না হলে রাত দুপুরে গণ্ডায় গণ্ডায় বুৎ-বালিশওয়ালারা কাফে রেস্তোরাঁয় ধন্না দিতে যাবে কেন?

তবে হ্যাঁ, পালিশ করতে জানে বটে। স্পিরিট দিয়ে পুরনো রঙ ছাড়ালে, সাবানজল দিয়ে অন্য সব ময়লা সাফ করলে, ক্রীম লাগালে, পলিশ ছোঁয়ালে, প্রথম হাল্কা ক্যাম্বিশ পরে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে জুতোর জৌলুস বাড়ালে। তখন জুতোর যা অবস্থা! তাতে তখন আয়নার মত মুখ দেখা যায়। বুরুষের ব্যবহার তো প্রায় করলেই না—চামড়া নাকি তাতে জখম হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য বোধ হল, সেই ঝাঁ চকচকে জুতোজোড়াকে সর্বশেষে কাপড় দিয়ে ঘষে অল্প—অতি অল্প—ম্যাটমেট করে দিল কেন? এতখানি মেহন্নৎ করে চাকচিক্য জাগানোর পর সেটাকে ম্যাটমেটে করে দেবার কি অর্থ?

একটা গল্প মনে পড়লো:

এক সাহেব পেসট্রিওলাকে অর্ডার দিলেন একটা জন্মদিনের কেক বানাবার জন্যে। কেকের উপরে যেন সেনালী নীলে তাঁ নামের আদ্য অক্ষর পি. বি. ডাব্‌লইউ লেখা থাকে। ডেলিভারি নেবার সময় দোকানদারকে বললেন, 'হুঁ', কেকটি দেখাচ্ছে উত্তম,

কিন্তু হরফগুলো বানানো হয়েছে সোজা অক্ষরে। আমি চাই ট্যারচা ধরনে, স্ক্রল্যাল ডিজাইনে।'

দোকানী খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। বললে, 'এক্ষুনি করে দিচ্ছি। জন্মদিনের ব্যাপার—চাট্টিখানি কথা নয়।'

প্রচুর পরিশ্রম করে সে কেকের উপরটা চেঁচে নিলে। তারপর প্রচুরতম গলদঘর্ম হয়ে তার উপর হরফগুলো বাঁকা ধরনে আঁকলে, আরো মেলা ফুল ঝালর চতুর্দিকে সাজালে।

সায়েব বললেন, 'শাবাশ, উত্তম হয়েছে।'

দোকানী খুশী হয়ে শুধালে, 'প্যাক করে আপনাকে দেব, না, কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে ?'

সায়েব হেসে বললেন, 'কোনোটাই না। আমি ওটা নিজেই খাবো।'

বলেই ছুরি দিয়ে চাকলা চাকলা করে গব-গব করে আস্ত কেকটা গিললেন।

দোকানি তো থ। তাহলে অত শত করার কি ছিল প্রয়োজন ?

বুৎ বালিশের বেলাও তাই।

বুৎ বালিশগুলাকে শুধালুম, পালিশ কমিয়ে দেওয়ার কারণটা কি ?

একটুখানি হকচকিয়ে সামলে নিয়ে বললে, 'গাঁইয়ারাই শুধু অত্যধিক চাকচিক্য পছন্দ করে। শহরের ভদ্রলোক সব জিনিসেরই মেকদার মেনে চলেন।'

অ—অ—অ— !

তখন মনে পড়লো, অবন ঠাকুরও বলেছেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আগের দিনে সোনার গয়না পরে পাল্কিতে বেরুবার সময় তার উপর মলমলের পট্টি বেঁধে নিতেন। বড্ড বেশী চাকচিক্য নাকি গ্রাম্যজন-সুলভ বর্বরতা !

১৭

আমরা তেতো, নোনা, ঝাল, টক, মিষ্টি এই পাঁচ রস দিয়ে ভোজন সমাপন করি। ইংরেজ খায় মিষ্টি আর নোনা ; ঝাল অতি সামান্য, টক তার চেয়েও কম এবং তেতো জিনিস যে খাওয়া যায়, ইংরেজের সেটা জানা নেই। তাই ইংরিজি রান্না আমাদের কাছে ভোঁতা এবং বিস্বাদ বলে মনে হয়। অবশ্য ইংরেজ ভালো কেক-পেস্‌ট্রি-পুডিং বানাতে জানে—তাও সে শিখেছে ইতালিয়ানদের কাছ থেকে এবং এ-কথাও বলবো আমাদের সন্দেশ রসগোল্লার তুলনায় এ-সব জিনিস এমন কী, যে নাম শুনে মূর্ছা যাবো ?

মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন—অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার। আমি প্রমাণ করতে পারবো না, কিন্তু বহু দেশে বহু রান্না খেয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, মোগলরা এ-দেশে যে মোগলাই রান্নার তাজমহল বানালেন (এবং ভুললে চলবে না, সে রান্না তাঁরা আপন দেশে নির্মাণ করতে পারেন নি, কারণ ওঁদের মাতৃভূমি তুর্কীস্থানে গরম মশলা গজায় না) তারই অনুকরণে আফগানিস্থান, ইরান, আরবীস্থান, মিশর—ইস্তেক স্পেন অবধি আপন আপন ক্ষুদে ক্ষুদে রান্নার তাজমহল বানাতে চেষ্টা করেছে। এ রান্নার প্রভাব পূর্ব ইয়োরোপের গ্রীস, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, ইতালি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এ সব তত্ত্ব আমার বহু দিনকার পরের আবিষ্কার। উপস্থিত আবুল আস্‌ফিয়া আর ক্লোদেৎ নিয়ে এলেন বারকোষে হরেক রকম খাবারের নমুনা। তাতে দেখলুম, রয়েছে মুর্গী মুসল্লম, শিক কাবাব, শামী কাবাব আর গোটা পাঁচ ছয় অজানা জিনিস। জানা

জিনিসগুলো যে ঠিক ঠিক কলকাত্তাই খুশবাই নিয়ে এল তা নয়, কিন্তু তাতেই বা কি? জাহাজের আইরিশ স্টু আর ইটালিয়ান মাক্কারনি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গিয়েছে; এখন এ-সব জিনিসই অমৃত। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছে ভাজা, সোনা মুগের ডাল, পটল ভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য—অত শত বলি কেন, শুধু ঝোল-ভাতের জন্য—কিন্তু ওসব জিনিস তো আর বাঙলা দেশের বাইরে পাওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কি লাভ?

তাই দেখিয়ে দিলুম, আমার কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন সেই বারকোষ থেকেই।

পাশের টেবিলে দেখি, একটা লোক তার প্লেটে দুটি শসা নিয়ে খেতে বসেছে। দুটি শসা—তা সে যত তিন ডবল সাইজই হোক না—কি করে মানুষের সম্পূর্ণ ডিনার হতে পারে, বহু চিন্তা করেও তার সমাধান করতে পারলুম না। তাও আবার দোকানে ঢুকে, টেবিল চেয়ার নিয়ে, সস্-চাটনি সাজিয়ে! আর ইংলণ্ডের মত 'খানদানী' দেশেও তো মানুষ রাস্তায় দুটো আপেল কিনে চিবোয়—রেস্তোরাঁয় ঢুকে সস্-চাটনি নিয়ে সেগুলো খেতে বসে না। তবে কি এদেশ ইংলণ্ডের চেয়েও খানদানীতর? এদেশে কি এমন সব সর্বনেশে আইন-কানুন আছে যে রাস্তায় শসা বিক্রি বারণ, যে-রকম শিবঠাকুরের আপন দেশে,

'কেউ যদি পা পিছলে পড়ে,
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজীর কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার।
সেথায় সন্ধ্যে ছটার আগে,
হাঁচতে হলে টিকিট লাগে;

হাঁচলে পরে বিন টিকিটে—
দম্‌দমাদম্‌ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে। (১)

কি জানি কি ব্যাপার!

এমন সময় দেখি, সেই লোকটা শসা চিবুতে আরম্ভ না করে তার মাঝখানে দিলে দুহাতে চাপ। অমনি হুড়হুড় করে বেরিয়ে এল পোলাও জাতীয় কি যেন বস্তু, এবং তাতেও আবার কি যেন মেশানো! আমি তো অবাক! হোটেলওলাকে গিয়ে বললুম, 'যা আছে কুল-কপালে, আমি ঐ শসাই খাবো।'

এল দুখানা শশা।[২] কাঁটা দিয়ে একটুখানি চাপ দিতেই বেরিয়ে এল পোলাও। সে পোলাওয়ের ভিতর আবার অতি ছোট ছোট মাংসের টুকরো (এদেশে যাকে বলা হয় 'কিমা'), টমাটোর কুচি এবং গুঁড়নো পনীর। বুঝলুম এ-সব জিনিস পুরেছে সেদ্ধ শসার ভিতর এবং সেই শসাটা সর্বশেষে ঘিয়ে ভেজে নিয়েছে। যেন মাছ-পটলের দোল্‌মা—শুধু মাছের বদলে এখানকার শসায় পোলাও, মাংস, টমাটো এবং চীজ! তার-ই ফলে অপূর্ব এই চীজ।

শসাকে চাক্তি করে পোলাওয়ের সঙ্গে মুখে দিয়ে বুঝলুম, একই গ্রাসে একই সঙ্গে ভাত, মাংস, সব্জী, ফল এবং 'সেভরি' খাওয়া হয়ে গেল।

আর সে কী সোয়াদ! মুখে দেওয়া মাত্র মাখমের মত গলে যায়। এ রকম পাঁচেক্কে পাঁচ পদ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও খাই নি।

আরেকটা জিনিস খেলুম সে-ও অতুলনীয়। মিশরি সিম-বীচি। 'আলীবাবা' বায়স্কোপে যে সব বিরাট বিরাট উঁচু তেলের জালা

১। সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল, পৃঃ ৩২, তৃতীয় সিগনেট সংস্করণ।

২। আসলে শশা নয়, এক রকমের ছোট লাউ।

দেখেছ, তারই গোটা দু-তিন সিমেতে ভর্তি করে সমস্ত রাত ধরে চালায় সিদ্ধকর্ম। সেই সিমে অলিভওয়েল আর এক রকমের মশলা মিশিয়ে খেতে দেয় সকাল বেলা থেকে। আমরা খেলুম রাত্তিরে। তার যা সোয়াদ!—এখনো জিভে লেগে আছে। আমাদের সিম-বীচি তার কাছে কিছুই না। পল-পার্সিও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলে চীন দেশের সোয়াবীনও এর সামনে কেন, পিছনেও দাঁড়াতে পারে না।

শুনলুম এই সিম-বীচি গরীব থেকে আরম্ভ করে মিশরের রাজা দুসন্ধ্যা খেয়ে থাকেন। হোটেলওলা বললে পিরামিড-নির্মাতা এক ফারাও-মহারাজা নাকি এই বীন খেতে এত ভালোবাসতেন যে, প্রজাদের বারণ করে দিয়েছিলেন তারা কেউ যেন বীন না খায়! সাধে কি আর লোকে ফারাওদের খামখেয়ালি বলতো?

শুনলুম এই বীনের আরবী শব্দ 'ফুল'।

পরের দিন সকাল বেলাকার ঘটনা। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ আছে বলে এই সুবাদেই বলে নি।

কাইরোতে ফরাসী, গ্রীক, ইতালী, ইংরেজ বসবাস করে বলে এবং জাত-বেজাতের বিস্তর টুরিস্ট আসে বলে কাইরোর বহু দোকানী তরো-বেতরো ভাষায় সাইন-বোর্ড সাজায়। পরদিন সকাল বেলা আমরা যখন শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরছি তখন দেখি, এক সাইন-বোর্ডে লেখা—

FOOL'S RESTAURANT

পল, পার্সি, আমি একসঙ্গেই বোর্ডটা দেখেছিলুম। একসঙ্গেই থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলুম। একসঙ্গেই অট্টহাস্য করে উঠলুম।

"আহাম্মুকদের রেস্তোরাঁ।"

বলে কি?

তখন হঠাৎ ঝাঁ করে আমার মনে পড়ল Fool শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 'ফুল' অর্থাৎ 'বীন' অর্থাৎ 'সিমের বীচি' অর্থে।

'আহাম্মুক' অর্থে নয়। অর্থাৎ এ দোকানী উত্তম 'সিম-বীচি' বেচে। তার পর দোকানের সামনে আমরা ত্রিমূর্তি উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখি, যে কটি খদ্দের সেখানে বসে আছে তাদের সক্কলেরই সামনে শুধু সিম-বীচি—'ফুল'—'Fool'।

* * * *

হাসলে তো?

আমিও হেসেছিলুম।

কিন্তু তার পর কলকাতা ফিরে—বহু বৎসর পরে—দেখি, এক দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা।

"কপির শিঙাড়া"

অর্থাৎ ফুলকপির-পুর-দেওয়া শিঙাড়া। এই তো?

আমি কিন্তু 'কপি' শব্দের অর্থ নিলুম 'বাঁদর'। অর্থাৎ বাঁদরদের শিঙাড়া। তা হলে অর্থ দাঁড়ালো, ও-দোকানে যারা শিঙাড়া খেতে যায় তারা বাঁদর। অর্থাৎ Fool's Restaurantতে যে রকম আহাম্মুকরা যায়!

যেমন মনে করো, যখন সাইন-বোর্ডে লেখা থাকে,—

"টাকের ঔষধ"

তখন কি তার অর্থ, 'টাক' দিয়ে এ ঔষধ তৈরী করা হয়েছে? তার অর্থ এ ঔষধ টেকোদের জন্য। এতএব 'কপির শিঙাড়ার' অর্থ ফুলকপি দিয়ে বানানো শিঙাড়া নয়, 'কপি'—বাঁদরদের জন্য এ শিঙাড়া!

বিজ্ঞাপনে মানুষ জানা-অজানাতে—অজানাতেই বেশী—কত যে রসিকতার সৃষ্টি করে তার একটা সচিত্র কলেকশন করেছিল আমার এক ভাইপো। 'হবি'টা মন্দ নয়। তার মধ্যে একটা ছিল ;—

বিসুর্দ্ধ ব্রাহ্ম্ভনের হাটিয়াল।

মচ্ছ—।০

মাঙ্গশ—॥০

যাক্‌গে এসব কথা। আবার কাইরো ফিরে যাই। আহারাদি সমাপ্ত করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলুম। আবুল আস্‌ফিয়া দেখলুম ড্রাইভারদের নিজের পয়সায় খাওয়ালেন। তার পর গাড়িতে উঠে বললেন, 'কাইরোতে ট্যাক্সি চালাবার অনুমতি তোমাদের নেই। অথচ আমরা তোমাদের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের যেখানে খুশি নিয়ে গিয়ে দুপয়সা কামাতে পারো।'

তারা তো প্রাঞ্জল প্রস্তাবখানা শুনে আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু আবুল আস্‌ফিয়া যে দর হাঁকলেন তা শুনে তাদের পেটের 'ফুল' পর্যন্ত আচমকা লাফ মেরে গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, আবুল আস্‌ফিয়া ইতিমধ্যে কাইরোতে ট্যাক্সি ফি মাইলে কত নেয় তার খবরটা জেনে নিয়েছেন এবং হাঁকছেন তার চেয়ে অনেক কম। এবার তিনি ওদের বাগে পেয়েছেন। ওরা বেশী কিছু আপত্তি জানালেই তিনি অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন, 'তা ভাই, তোমরা যদি না যেতে চাও তবে যাবে না। আমি তো আর তোমাদের বাধ্য করতে পারিনে। তোমাদের যদি, ভাই, বড্ড বেশী পয়সা হয়ে যাওয়ায় আর কামাতে না চাও, তা হলে আমি আর কি করতে পারি বলো? আল্লা তালাও তো কুরান শরীফে বলেছেন, 'সন্তুষ্টি সদ্‌গুণ'।'

তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে, ভাইরা, আমরা তা হলে অন্য ট্যাক্‌সি নি। তোমরা সুয়েজ ফিরে যাও। আল্লা তোমাদের সঙ্গে থাকুন; রসুল তোমাদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু ভাই, এ কঘণ্টা তোমাদের সঙ্গে কেটেছিল বড় আনন্দে।'

কেটেছিল আনন্দে না কচু! পারলে আবুল আস্‌ফিয়া ওদের গলা কাটতেন।

কিন্তু আশ্চর্য হলুম লোকটার 'ভণ্ডামি' দেখে। গুটিকয়েক টাকা বাঁচাবার জন্য কি অভিনয়ই না লোকটা করলে!

আর পায়রার মত বক্‌বকানি! এবং এ সেই লোক যে জাহাজে যে ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকতো তাতে মনে হত কথ   বলা রেশন্‌ড হয়ে গিয়েছে।

ঠিক আবুল আস্‌ফিয়ার দরে নয়, তার ৫   সামান্য একটু বেশী রেটে তারা শেষটায় রাজী হল।

আবুল আস্‌ফিয়া মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'পিরামিড'। ততক্ষণে আমরা কাইরো শহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি।

কোথায় লাগে কলকাতা রাত বারোটার সময় কাইরোর কাছে। গণ্ডায় গণ্ডায় রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা, ডান্‌স-হল কাবারে। খদ্দেরে খদ্দেরে তামাম শহরটা আব্‌জাব করছে।

আর কত জাত-বেজাতের লোক।

ঐ দেখ, অতি খানদানী নিগ্রো। ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দু খানা ঠোঁট, বোঁচা নাক, ঝিনুকের মত দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য! আমি জানি এরা তেল মাখে না, কিন্তু আহা, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে। এদের চামড়া এতই সুচিক্কণ সুমসৃণ যে আমার মনে হয়, এদের শরীরে মশা-মাছি বসতে পারে না—পিছলে পড়ে মশার পা দুখানা কম্পাউণ্ড ফ্রেকচর হয়ে যায়, ছ মাস পট্টি বেঁধে হাসপাতালে থাকতে হয়।

ঐ দেখো, সুদানবাসী। সবাই প্রায় ছ ফুট লম্বা। আর লম্বা আলখাল্লা পরেছে বলে মনে হয় দৈর্ঘ্য ছ ফুটের চেয়েও বেশী। এদের রঙ ব্রোঞ্জের মত। এদের ঠোঁট নিগ্রোদের মত পুরু নয়, টক্‌টকে লালও নয়। কিন্তু সবচেয়ে দেখবার মত জিনিস ওদের দুখানি বাহু। এক্কেবারে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে আজানুলম্বিত—অর্থাৎ জানুর শেষ পর্যন্ত যেখানে হাটুর হাড্ডি অর্থাৎ 'নী ক্যাপ' সেই অবধি।

শ্রীরামচন্দ্রের বাহু ছিল আজানুলম্বিত এবং তার রঙ ছিল নবজলধরশ্যাম, কিংবা নবদূর্বাদলশ্যাম। তবে কি শ্যামবর্ণ কিম্বা

ব্রোঞ্জ-বর্ণ না হলে বাহু এতখানি লম্বা হয় না। তবে কি ফর্সাদের হাত বেঁটে, শ্যামলিয়াদের হাত লম্বা? কে জানে! সুযোগ পেলে কোনো এক তাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করতে হবে।

হঠাৎ দেখি, সম্মুখে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য!

সমস্ত রাস্তা জুড়ে এত ভিড় যে দুখানা গাড়িকেই বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল। আমি বারণ করার পূর্বেই পল পার্সি দুজনাই লাফ দিয়ে উঠে গেল হুডের উপর। ওরা দেখতে চায়, ভিড়ের মাঝখানের ব্যাপারটা কি। আমার ওসব জিনিস দেখবার বয়স গেছে। মাদমোয়াজেল ক্লদেৎ শেনিয়ে পর্যন্ত উঠি উঠি করছিলেন; আমি তাঁকে বাইরে যেতে বারণ করলুম।

ইতিমধ্যে ঘোড়-সওয়ার পুলিশ এসে রাস্তা খানিকটে সাফ করে দেওয়াতে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। পল-পার্সি হুড্ থেকে নেমে এসে আমার দু পাশে বসেছে।

আমাকে কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করতে হল না, ব্যাপার কি। ওরা উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে। একসঙ্গে কথা বলছে। শেষটায় পলকে বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'পার্সি, তুমিই বলো কি হয়েছিল?'

'ঐ যে আপনি দেখালেন সুদানবাসীদের, তাদেরই এক জন একটা ইংরেজ-সেপাইয়ের গলা ধরেছে বাঁ হাত দিয়ে আর ঠাস্-ঠাস্ করে চড় মারছে ডান হাত দিয়ে। গোরা কিছুই করতে পারছে না, কারণ সুদানীর হাত লম্বা বলে গোরাকে এমনই দূরে রেখেছে যে, গোরা তার গাল নাগাল পাচ্ছে না। এ রকম তো চললো মিনিট দু-তিন। তার পর পুলিশ এসে গোরাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'সুদানীই তো ঠ্যাঙাচ্ছিল; তাকে ধরে নিয়ে গেল না? যে মার খেল তাকে ধরে নিয়ে গেল, যে মার দিলে তাকে ধরে নিয়ে গল না, এটা কি করে হয়?'

পল-পার্সি সমস্বরে বললে, 'সেই তো মজার কথা, স্যর! সাংহাই-টাংহাই কোনো জায়গাতে কেউ যদি গোরাকে ঠ্যাঙায়, তবে তাকেই ঠ্যাঙাতে-ঠ্যাঙাতে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। কেউ একবারের তরেও প্রশ্ন করে না দোষটা কার?

আমি তখন ড্রাইভারকে রহস্য সমাধান করার জন্য অনুরোধ

ড্রাইভার বললে, 'দারোয়ানির কাজ এ-দেশে করে সুদানীরা। তাদের উপর কাইরোবাসীদের অসীম বিশ্বাস। কোনো সুদানী কখনো কোনো প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, এ কথা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমার কানে কখনও পৌঁছয় নি। এরা বড়ই ধর্মপ্রাণ। পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ যায়, তসবী জপে। আর বসে বসে বাড়ি আগলায়। এই যে সুদানী গোরাকে মার দিচ্ছিল, সে এক রেস্তোরাঁর দারওয়ান। গোরা রেস্তোরাঁয় খেয়ে-দেয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে হোটেলওলা তাকে চ্যালেঞ্জ করে খেল ঘুষি। তখন সুদানী দারওয়ান তার যা কর্তব্য তাই করেছে। পুলিশ একবার জিজ্ঞেস করেই বিশ্বাস করেছে সুদানীকে, আর ধরে নিয়ে গিয়েছে গোরাকে। সবাই জানে, সুদানীরা বড় শান্ত স্বভাব, তারা মারপিটের ধার ধারে না।'

যাক্‌, সব বোঝা গেল। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করবো; একা একা কারো সাহায্য না নিয়ে, পল্টনের গোরাকে ঠ্যাঙাতে পারে সুদানীই। পাঠান পারে কি না জানিনে। পারলে পারতেও পারে, কিন্তু তার বাহু আজানুলম্বিত নয় বলে সেও নিশ্চয় দুচার ঘা খাবে।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় অতি দৈবাৎ। তা-ও দু-এক ইঞ্চির বেশী নয়। তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল-কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে। শুনলুম, এখানকার বায়স্কোপও বেশীর ভাগ হয় খোলা-মেলাতে।

বাঙলা দেশে আমরাও চায়ের দোকানে বসে গালগল্প করে সময় কাটাই। কেউ কেউ হয়তো রোজ একই দোকানে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটায়, কিন্তু কাফেতে বসে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটানোর রেওয়াজ আরম্ভ হয় ফ্রন্টিয়ার থেকে। কাবুলে দেখবে, চার বন্ধু চলেছেন বরফ ভেঙে চা-খানায় গিয়ে গল্পগুজোব করবেন বলে—যেন বাড়িতে বসে ও-কর্মটি করা যায় না। ওদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, 'বাড়িতে মুরুব্বিরা রয়েছেন, কখন এসে কাকে ধমক লাগান তার ঠিক নেই। কিংবা হয়তো বলবেন, 'দেখ বাছা, ফিরোজ বখ্‌ৎ, যাও দিকিনি মামার বাড়িতে—(আড়াই মাইলের ধাক্কা) সেখানে গিয়ে মামাকে বলো, আমার নাকের ফুস্‌কুড়িটা একটু সেরেছে, তিনি যেন চিন্তা না করেন। আর দেখো, আসবার সময় ধোপানীকে একটু শুধিয়ে এসো—(সে আরো দেড় মাইলের চক্কর)—আমার নীল জোব্বাটা,'—ইত্যাদি।

'এবং সব চেয়ে বড় কারণ, বাড়িতে মা-জ্যাঠাই-মা ওরকম জালা জালা চা দিতে রাজী হন না। ওনারা যে কঞ্জুস তা নয়। আমি যদি এখখুনি বলি 'জ্যাঠাই মা, আমার বন্ধুরা এসেছে, ওরা বলেছে, পিসিমার বিয়ের দিনে আপনি যে দুম্বা-মুসল্লম করেছিলেন তারা সেইটে খাবে। কিন্তু ওদের বায়নাক্কা, দুম্বার ভিতর যেন কোফতা পোলাও আর মুর্গী থাকে, মুর্গীর ভিতর যেন কিমা পোলাও আর আণ্ডা থাকে এবং আণ্ডার ভিতর যেন পোনা মাছের পুর থাকে, জ্যাঠাইমা তদ্দণ্ডেই লেগে যাবেন ঐ বিরাট রান্না করতে। তাতে দশ[illegible] যা লাগে লাগুক।

'অথচ আমাদের চায়ের খরচা এক সন্ধ্যায় কতটুকুন? দু আনা চার আনা, মেরে কেটে আট আনা। উহুঁ সেটি হচ্ছে না। ঘন ঘন চা খেলে নাকি ক্ষিদে মরে যায়, আহারের রুচি একদম লোপ পেয়ে যায়।

'তাই, ভাই চায়ের দোকানই প্রশস্ততর। সেখানে এক বার

ঢুকতে পারলে বাবা-চাচার তম্বিতম্বার ভয় নেই, মামা-বাড়িতে গিয়ে বাবার নাকের ফুস্‌কুড়িটার লেটেস্ট বুলেটিন ঝাড়তে হয় না, জ্বালা-জ্বালা চা পাওয়া যায়, অন্ত দু-চার জন ইয়ার দোস্তের সঙ্গে মোলাকাৎও হয়, তাস-দাবা যা খুশি খেলাও যায়—সেখানে যাবো না তো, যাবো কোথায় ?'

প্রথম বারেই প্রথম কাবুলী ভদ্রসন্তান যে আমাকে এই সব কারণ এক নিশ্বাসে বুঝিয়ে বলেছিল তা নয়, একাধিক লোককে জিজ্ঞেস করে ক্রমে ক্রমে চায়ের দোকানে যাবার যাবতীয় কারণ আমি জানতে পেরেছিলুম।

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, এঁরা সত্য কথাই বলেছিলেন, এবং এঁরা যে ঘর ছেড়ে চায়ের দোকানে যান তাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, বাঙালীদের বেলাও তো এই সব আপত্তি-ওজুহাত টেকে। আমাদের মা-পিসিরাও চান না আমরা যেন বড্ড বেশী চা গিলি, বাবা-কাকাও ফাই-ফরমায়েস দেওয়াতে অতিশয় তৎপর; তবে আমরা চায়ের দোকানকে বাড়ির ড্রইংরুম করে তুলিনে কেন?

এর সদুত্তর আমি এযাবৎ পাই নি। তা সে যাই হোক, এটা বেশ লক্ষ্য করলুম, রাত বারোটা একটা অবধি কাফেতে বসে সময় কাটানোতে কাইরোবাসী সবচেয়ে বড় ওস্তাদ; বন্ধুর বাড়িতে জমানো আড্ডা দশটা-এগারটার ভিতর ভেঙে যায়, কারণ বাড়িসুদ্ধ লোক তাড়া লাগায় খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ার জন্য। এখানে সে ভয় নেই। উঠি-উঠি করে কেউই ওঠে না। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তারা তার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুনেছি, এখানকার কোনো কোনো কাফে খোলে রাত বারোটায়!

মোটর গাড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সব-কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এইবারে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতিরমণীয় এক দৃশ্য! নাইল, নীল নদ।

আমি পূব বাঙলার ছেলে। যা-তা নদী আমাকে বোকা বানাতে পারে না। আমি যে গাঙে সাঁতার কাটতে শিখেছি সেই ছোট্ট মনু নদ থেকে আরম্ভ করে আমি বিস্তর মেঘনা-পদ্মা, গঙ্গা-যমুনা এবং পরবর্তী যুগে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী তাপ্তী-নর্মদা-সিন্ধু, ইয়োরোপে রাইন-ডানয়্যুব-মোজেল-রোন দেখেছি। নদী দেখলে আর পাঁচ জন বাঙালের মত আমিও গামছা খুঁজতে আরম্ভ করি—ঐ নদীতে কটা লোক গত সাত শ' বছরে ডুবে মরেছিল তার স্টাটিস্টিক্সের সন্ধান না নিয়ে—একটা ডিঙি কি কৌশলে চুরি করা যায় তার সন্ধানে মাথায় গামছা বেঁধে নি, পাটনিকে কি প্রকারে ফাঁকি দিয়ে খেয়া নৌকো থেকে নামতে হয় সেটা এক মুহূর্তেই আবিষ্কার করে ফেলি।

এই যে পৃথিবীর সব চেয়ে মধুর ভাটিয়ালী গীত! সৃষ্টিকর্তা যদি তাঁর পূব-বাঙলার লীলাঙ্গনে শত শত নদীর আলপনা না আঁকতেন তবে কি কখনো ভাটিয়ালী গানের সৃষ্টি হত? আর এ কথাও ভাবি; তিনি রচেছেন মোহনিয়া প্রবাহিণী আর আমরা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রচেছি ভাটিয়ালী। অবশ্য তাঁরই কাছ থেকে ধার করে! আমরা যখন ও—ও—ও—বলে ভাটিয়ালীর লম্বা সুর ধরি, মাঝে মাঝে কাঁপন জাগাই তখন কি স্পষ্ট শুনতে পাও না, দেখতে পাও না, 'ও—'র লম্বা টানে যেন নদী শান্ত হয়ে এগিয়ে চলছে, যখন কাঁপন লাগাই তখন মনে হয় না, নদী যেন হঠাৎ থমকে গিয়ে দ'য়ের সৃষ্টি করেছে?

প্যারিস্-ভিয়েনার রসিকজনের সম্মুখে আমি আমার হাজারোটা নদী কাঁধে বয়ে নিয়ে হাজির করতে পারবো না, কিন্তু ভাটিয়ালীর একখানা উত্তম রেকর্ড শুনিয়ে দিতে পারি।

আমি বে-আক্কেল তাই এক বার করেছিলুম। তার কি জরিমানা দিয়েছিলুম শোনো।

ভিয়েনাতে পাশের ঘরে থাকতো এক রাশান। সে এসেছিল সেখানে কণ্টিনেন্টাল সঙ্গীত শিখতে। ভিয়েনা শহর বেটোফেন্

মোৎসার্টের কর্মভূমি—আমাদের যে রকম তানসেন, ত্যাগরাজ, বাঙালীর যে রকম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইস্‌লাম।

ভিয়েনা ডানয়্যুব নদীর পারে। 'ব্লু ডানয়্যুব' তোমাদের কেউ কেউ হয়তো শুনেছ।

একদিন সেই রাশান বললে, 'ডানয়্যুব, ফানয়্যুব সব আজে-বাজে নদী। এ সব নদী থেকে আর কি গান বেরিয়েছে যে পাল্লা দেবে। আমার রাশার ভল্‌গা নদী থেকে যে ভলগার মাঝির গান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? তুমি 'গড্‌'-'ফড্‌' কি সব মানো না? আমি মানি নে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতিকে। তারই অন্যতম মধুর প্রকাশ নদীতে। সেই নদীকে আমরা মাধুর্যে হার মানাই ভল্‌গা মাঝির গান দিয়ে।' (২)

বাড়ি ফেরা মাত্রই সে ভল্‌গা-মাঝির রেকর্ড শোনালে। আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'চমৎকার!'

কিন্তু ততক্ষণে আমার বাঙাল রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। বাঙালরা অবশ্য জানো, তার অর্থ কি? 'ঘটি' অর্থাৎ পশ্চিম-বাঙলার লোক তাই নিয়ে হাসাহাসি করে করুক। আমার তাতে কোনো খেদ নেই। ওরা তো আমাদের ভাটিয়ালী ভালোবাসে, আমরা তো ওদের 'বাউল' শুনে 'বাউলে' হয়ে যাই।

আমার গরম রক্ত তখন টগবগ করে বলছে, 'বাঙলা দেশ শত শত নদীর দেশ। রাশাতে আর ক-টা নদী আছে? তারই একটা, ভল্‌গা। সে নদী হারিয়ে দেবে বাঙলা দেশের তাবৎ নদীকে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

ভাগ্যিস, আব্বাস উদ্দিনের 'রঙিলা নায়ের মাঝি' আমার কাছে ছিল। সেইটে চড়িয়ে দিলুম রাশানের গ্রামোফনে।

(২) রবীন্দ্রনাথও এই 'দম্ভ' করেছেন তাঁর 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' গানে। রেকর্ডে গেয়েছেন, শ্রীযুক্তা রাজেশ্বরী বাসুদেব।

সে চোখ বন্ধ করে শুনলে। তার পর বললে—যা বললে তার অর্থ—'ধাপ্পা'।

আমি বললুম, 'মানে?'

সে বললে, 'সুরটি অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং তার চেয়েও বেশী কানে ধরা পড়ে ওর অভিনবত্ব। আমি করজোড়ে স্বীকার করছি, এ রকম গীত আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো, এ গীত লোক-গীত নয়। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো ভূমিতেই গ্রাম্য গীতে এতগুলো 'নোট' লাগে না। তাই বলছিলুম, তুমি ধাপ্পা দিচ্ছো।'

আমি বললুম, 'বাছা, ঐ হল ভাটিয়ালীর বৈশিষ্ট্য। ও যতখানি ওঠা-নামা করে পৃথিবীর আর কোনো লোক-গীত তা করে না।'

কিছুতেই স্বীকার করে না ওটা লোক-গীত। তার ধারণা ওটা লোক-গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝখানে উপস্থিত ঝুলছে, আর কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই কোনো গুণী সেটাকে 'উচ্চাঙ্গ' শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বরণ করে তুলে নেবেন।

তার পর এক দিন সে স্বীকার করলে। বি বি সি-র কল্যাণে। বি বি সি পৃথিবীর লোক-গীত শোনাতে শোনাতে ভাটিয়ালী শুনিয়ে বললে এটা পূব বাঙলার লোক-গীত।

আমি লড়াই জিতলুম কিন্তু তখন থেকেই শুরু হল আমার জরিমানা। আশ্চর্য লাগছে না, যে জিতলে সে দেবে জরিমানা! হয়, প্রায়ই হয়। মার্কিনিংরেজ জর্মণী জয় করে বহু বৎসর ধরে সেখানে ঢালছে এবং এখনো ঢালছে বিস্তর টাকা। সে কথা যাক্। জরিমানাটা কি ভাবে দিতে হল বুঝিয়ে বলি।

এর পর যখনই সে আমাকে সাজা দিতে চাইত তখনই তার বেয়ালাতে বাজাতে আরম্ভ করতো ভাটিয়ালীর সুর।

বোঝো অবস্থাটা! বিদেশে বিভুঁইয়ে একেই দেশের জন্য মন আঁকুপাঁকু করে তার উপর ভাটিয়ালীর করুণ টান!

রবীন্দ্রনাথের শ্রীকণ্ঠ বাবুর মত(৩) আমি কাতর রোদনে তাঁকে বেয়ালা বন্ধ করতে অনুনয়-বিনয় করতুম।

কিন্তু আজও বলি, লোকটা যা বেয়ালাতে ভাটিয়ালী চড়াতে পারতো তার তুলনা হয় না।

কত দেশ ঘুরলুম, কত লোক দেখলুম, কত অজানা জনের প্রীতি পেলুম, কত জানা জনের দুর্ব্যবহার, হিটলারের মত বিরাট পুরুষের উত্থান-পতন দেখলুম, সে সব বড় বড় জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছি, কিন্তু এই সব ছোট-খাটো কিছুতেই ভুলতে পারিনে। মনে হয় যেন আজ সকালের ঘটনা।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের উপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনী নৌকা—হাওয়াতে কাত হয়ে তেকোণা পাল পেটুক ছেলের মত পেট ফুলিয়ে দিয়ে। হাওয়া বইছে সামান্যই, কিন্তু এই পেটুক পাল এর, ওর সবার খাবার যেন কেড়ে নিয়ে পেটটাকে ঢাকের মত ফুলিয়ে তুলেছে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয় নৌকোটা পেছনের ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয়। এই নীল তাঁর বুকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেন। তাই এ দেশের কবি গেয়েছেন,

> ওগো নীলনদ প্লাবিতা ধরণী আমি ভালোবাসি তোরে,
> ঐ ভালোবাসা ধর্ম আমার কর্ম আমার ওরে।

(৩) রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, ২১৫ পৃঃ।

১৮

পিরামিড ! পিরামিড !! পিরামিড !!!

কোনো প্রকাশের আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা তিনটে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন—!!!—দিই। তাই কি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড ? কিম্বা উল্টোটা ? তিনটে পিরামিড ছিল বলে আমরা তিনবার আশ্চর্য হই ?

এই পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে যা গাদা-গাদা বই লেখা হয়ে গিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা আস্ত জলে-ডাঙায় লিখতে হয়। কারণ এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ—যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছে, দেয়ালে-খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে, জান তো, পিরামিডের ঠিক মাঝখানে একটা কুটুরিতে বিস্তর ধনদৌলত জড়ো করা আছে—তারই পথ অনুসন্ধান করছে পাকা সাড়ে ছ হাজার বছর ধরে। ইরানী গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্কী, ফরাসী, ইংরেজ, পর পর সবাই এদেশ জয় করার পর প্রথমেই চেষ্টা করেছে পিরামিডের হাজার হাজার মন পাথর ভেঙে মাঝখানের কুটুরিতে ঢুকে তার ধনদৌলত লুট করার। এবং আশ্চর্য, যিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারলেন তিনি ধন লুটের মতলবে ঢোকেন নি। তিনি ঢুকেছিলেন নিছক ঐতিহাসিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য। ফারাওয়ের রাজমিস্ত্রীরা কুটুরি বানানো শেষ করার পরে বেরোবার সময় এমন-ই মস্ত পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দেয়ালে পালিশ পলস্তরা লাগিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর মানুষের সাড়ে ছ হাজার বছর লাগলো ভিতরে যাবার রাস্তা বের করতে।

মিশরের ভিতরে বাইরে আরও পিরামিড আছে, কিন্তু গিজে অঞ্চলের যে তিনটে পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, সেগুলোই ভুবন-বিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

রাজা	নির্মাণের সময়	ভূমিতে দৈর্ঘ্য	উচ্চতা
খুফু	৪৭০০ খৃঃ পূঃ	৭৫৫ ফুট	৪৮১ ফুট
খাফ্রা	৪৬০০ „ „	৭০৬ „	৪৭১ „
সেনকাওরা	৪৫৫০ „ „	৩৪৬ „	২১০ „

প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বললে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মত একই সাইজ রেখে উঁচু হত, তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু!

বোঝা যায়, দূরে চলে গেলে। গিজে এবং কাইরো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটে পিরামিড, সব কিছু ছাড়িয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর পিরামিড ছেড়ে যদি সোজা মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলে যাও, তবে মনে হবে সাহারার শেষ প্রান্ত পৌঁছে যাওয়ার পরও বুঝি পিরামিড দেখা যাবে!

তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরী করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। 'টুকরো' বলতে একটু কমিয়ে বলা হল, কারণ এর চার-পাঁচ টুকরো একত্র করলে একখানা ছোটখাটো এঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারো, ছ ফিট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এই পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছশ পঞ্চাশ মাইল হবে। অর্থাৎ সে দেয়াল কলকাতা থেকে দার্জিলিং গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে!

সব চেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল।

ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে এক-লক্ষ লোককে বিশ বচ্ছর খাওয়াতে পরাতে পেরেছিলেন। অন্য খরচের কথা বাদ দাও, এই এক লক্ষ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সেটা গড়ে তোলা এবং তাকে বিশ বচ্ছর ধরে চালু রাখা তারাই করতে পারে, যারা সভ্যতার খুব একটা উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।

এইবারে আমরা পিরামিড নির্মাণের কারণের কাছে পৌঁছে গিয়েছি।

প্রথম কারণ সকলেরই জানা। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায়, কিম্বা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয়, তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে 'মামি' বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হত যে, তার ভিতরে ঢুকে কেউ যেন 'মামি'কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে। কিন্তু হায়, তাদের এ-বাসনা পূর্ণ হয় নি। পূর্বেই বলেছি, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করে দুষ্ট (অর্থাৎ ডাকাতরা) এবং শিষ্টেরা (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা) শেষ পর্যন্ত তাদের গোপন কবরে ঢুকতে পেরেছেন। তাই করে অবশ্য গৌণতঃ কোনো কোনো ফারাওয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে —পণ্ডিতেরা তাঁদের মামি সযত্নে জাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তাঁরা অক্ষত দেহে মহাপ্রলয়ের দিন গুণছেন, যেদিন তাঁরা নব দেহ নব যৌবন ফিরে পেয়ে অমৃত লোকে অনন্ত জীবন আরম্ভ করবেন।

কিন্তু যদি ইতিমধ্যে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়? ফলে গুটিকয়েক অ্যাটম বম পড়ে? তবে?

আমার মনে ভরসা, এঁরা যখন চোর-ডাকু ধনিক-পণ্ডিতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এত হাজার বৎসর অক্ষত দেহে আছেন

তখন মহাপ্রলয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন-ই যাবেন। অ্যাটম বম্ পড়ার উপক্রম হলে আমি বরঞ্চ তারই একটার গা ঘেঁষে গিয়ে বসবো। মামিটা রক্ষাকবচের মত হয়ে তার দেহকে তো বাঁচাবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বাঁচিয়ে দেবে। চাই কি, গোটা শহরটাই হয়তো বেঁচে যাবে!

পিরামিড নির্মাণের দ্বিতীয় কারণ,—এই কারণের উল্লেখ করেই আমি এ অনুচ্ছেদ আরম্ভ করেছি—

ফারাওরা বলতে চেয়েছিলেন, সভ্যতার যে স্তরে আমরা এসে পৌঁচেছি, আমরা যে প্রতাপশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি, সেগুলো যেন এই পিরামিডের মত অজর অমর এবং বিশেষ করে অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। 'পরিবর্তন যেন না হয়', 'যা-আছে তাই থাকবে', এই ছিল পিরামিড গড়ার দ্বিতীয় কারণ। পিরামিড জগদ্দল পাথর হয়ে—অতি শব্দার্থে জগদ্দল পাথরই বটে—যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য, রাজবংশ, ধর্মনীতি, সবকিছু অপরিবর্তনীয় করে চেপে ধরে রাখবে।

তাই পিরামিড দেখে মানুষের মনে জাগে ভয়। আজ যদি সেই ফারাও বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁর প্রতি জাগতো ভীতি। এই পিরামিড যে তৈরী করতে পেরেছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার কল্পনাও তো মানুষ করতে পারে না।

তাজমহলের গীতিরস কঠিন মানুষের পাষাণ হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়, কুতুবমিনারের ঋজু দেহ উন্নত শির দুর্বলজনকে সবল হয়ে দাঁড়াতে শেখায়—এই দুই রস কাব্যের, সঙ্গীতের প্রাণ। তাজমহল নিয়ে তাজমহলের মত কবিতা রচনা করা যায়, কিন্তু পিরামিড নিয়ে কবিতা হয়েছে বলে শুনিনি। বরঞ্চ পিরামিডের দোহাই দিয়ে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের অনুকরণে আজ এক নূতন ইজিয়পশিয়ন অর্ডিনান্স তৈরী করা যায়।

কিন্তু হায়, ফারাওরা 'অপরিবর্তনের' যে অর্ডিনান্স জারী করে

বিরাট বিরাট পিরামিড গড়েছিলেন, সেটা টিকলো না। ফারাও বংশ ধ্বংস হল, দূর ইরানের রাজারা মিশর লণ্ডভণ্ড করে দিল, তারপর গ্রীক, রোমান, এবং শেষটায় সারা মিশরের লোক ইসলাম গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নূতন পথে চললো। মুসলমানরা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য চেনে। অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য দেহটাকে যে মামি করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, সে কথা তারা বোঝে।

কিন্তু ফারাওদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। প্রায় সব দেশেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে বলেছে, 'এই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচেছি, আর এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। যা সঞ্চয় করেছি তাই বেঁচে থাকুক, সেইটেই অপরিবর্তনীয় হয়ে থাক।' ফলে হয়েছে পতন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিষয় নিয়ে 'তাজমহলের' মত কবিতা লিখেছেন তখন আমার আর বাক্যব্যয় করার কি প্রয়োজন?

চাঁদের আলোতে বিশ্বজন তাজমহল দেখবার জন্য জড় হয়।

পিরামিডের বেলাও তাই।

চতুর্দিকে লোকজন গিস্‌গিস্‌ করছে। এদেশের মেলাতেও বোধ করি এত ভিড় হয় না।

অবশ্য তার কারণও আছে। নিতান্ত শীতকাল ছাড়া গরমের দেশে দিনের বেলা কোনো জিনিস অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে দেখা যায় না। বিশেষ করে যেখানে কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখবার বালাই নেই সেখানে তো আরো ভালো। তাজের মিহি কাজ চাঁদের আলোতে চোখে পড়ে না, তবু সবসুদ্ধ মিলিয়ে তার যে অপূর্ব সামঞ্জস্য চাঁদের আলোতে ধরা দেয় দিনের কড়া আলোতে সেটা দর্শককে ফাঁকি দেয় বলে মানুষ চাঁদের আলোতে তাজ দেখে। পিরামিডে সে রকম কোনো নৈপুণ্য নেই, তদুপরি পিরামিডের চতুর্দিকে মরুভূমি বলে সেখানে দিনের বেলাকার গরম পীড়াদায়ক, কাজেই নিতান্ত শীতকাল ছাড়া দিনের বেলা কম লোকই পিরামিড দেখতে যায়।

পক্ষান্তরে শীতের দেশে ব্যবস্থা অন্যরকম। আমি ফটফটে চাঁদের আলোতে কলোন্‌ গির্জার পাশ দিয়ে শীতের রাতে হি-হি করে বহুবার বাড়ি ফিরেছি। কাক-কোকিল দেখতে পাই নি।

পল পার্সি আর আমাদের দলের আরো কয়েকজন পিরামিডের মাঝখানকার কবর-গৃহ দেখতে গেছেন। আমি যাই নি।

আমি বসে বসে শুনছি, জাত-বেজাতের কিচিরমিচির, স্যাণ্ডউইচ খোলার সময় কাগজের মড়মড়, সোডা-লমেনেড খোলার ফটাফট। ইয়োরোপীয়েরা খাবার ব্যবস্থা সঙ্গে না নিয়ে তিন পা চলতে পারে

না। পিরামিড হোক আর নিমতলাই হোক, মোকামে পৌঁছন মাত্রই বলবে, 'টম্, বাস্কেটটা এই দিকে দাও তো। ডিক্, তুমি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালো' আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে 'ডার্লিং, আপেলগুলো ভুলে যাওনি তো?' ইতিমধ্যে হ্যারি হয়তো গ্রামোফোনের জাঁতা চালিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যদি দলে মেয়েরা ভারী হন তবে কোনো-কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। 'লাভলি', 'গ্র্যাণ্ড', 'সবলাইম' ইত্যাদি শব্দে তখন যে ঘ্যাট তৈরী হয় তার কোনটা কি, ঠিক ঠাহর করা যায় না।

কোনো কোনো টুরিষ্ট আমাকে বলেছেন, নায়াগ্রার গম্ভীর জল নির্ঘোষ শুনতে হলে নাকি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে নেই। যে ধ্বনি তাদের ভিতর ওঠে তাতে নাকি নায়াগ্রার—থাক্, মেয়েরা আমার উপর এমনিতেই চটে আছেন। কিন্তু আমার উপর চটে আর লাভ কি? ওঁয়াদের খাস-পেয়ারা কবি রবিঠাকুরই এ-বাবদে কি বলেছেন?—

'ছেলেরা ধরিল পাঠ, বুড়ারা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।'

পল পার্সি ফিরে এসেছে। আমি শুধালুম, 'কি দেখলে, বাছারা?' তারপর নোটবুক খুলে বললুম, 'গুছিয়ে বলো, সব-কিছু টুকে নেব; আমি তো বে-আক্কেলের মত এইখানে বসে বসে সময় কাটালুম।'

পার্সি করুণ কণ্ঠে বললে, 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না, স্যার। দেখেছি কচু পোড়া। মশালের আলোতে হাতের তেলো চোখে পড়ে না। তারই জোরে বিস্তর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা চৌকো ঘরে শেষটায় পৌঁছলুম। এক দম ফাঁকা। এক কোণে একখানা ভাঙ্গা ঝাঁটা পর্যন্ত নেই। গাইড বললে, 'ব্যস্ ফিরে চলুন।' আপনি তখনই বারণ করলেন না কেন?'

আমি বললুম, 'বারণ করলে কি শুনতে? বাকী জীবন মনটা খুঁৎখুঁৎ করতো না, ফারাওয়ের শেষ শোওয়ার ঘর দেখা হল না? এ হল দিল্লীর লাড্ডু।'

শুধালে 'সে আবার কি?'

আমি বুঝিয়ে বললুম।

পল বললে, 'গাইড বলছিল, পিরামিডের যে বিরাট বিরাট পাথর সেগুলো নাকি টেনে টেনে নদীর ওপার থেকে এখানে আনা হয়েছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—ওর যা ইংরেজি!'

আমি বললুম, 'ঠিকই বলেছে! নীলের এপারে পাথর পাওয়া যায় না। তাই ওপার থেকে পাথর কেটে ভেলায় করে এপারে নিয়ে আসা হত। আর সে যুগে মানুষ চাকা কি করে বানাতে হয় জানতো না বলে সেই পাথরগুলো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত। কাঠ বাঁশ দিয়ে পথ তৈরী করা হত পিছলে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্য। এবং শুনেছি, সে পথে নাকি ঘড়া ঘড়া তেল ঢালা হত, সেটাকে পিছলে করার জন্য। আশ্চর্য নয়। এর ছুটা পাথরে যখন একটা এঞ্জিনের আকার ধরতে পারে, এবং স্পষ্ট দেখেছি, এঞ্জিন রেল লাইন থেকে কাৎ হয়ে পড়ে গেলে তাকে খাড়া করবার জন্য আজকের দিনের কপিকল পর্যন্ত কি রকম হিমসিম খায়, তখন আর তেল ঘি ঢালার কথা তো আর অবিশ্বাস করা যায় না।'

তখন আলোচনা আরম্ভ হল চাকা আবিষ্কার নিয়ে। আগুন যে রকম মানুষকে সভ্যতার পথ দেখিয়ে দিল, চাকাও মানুষকে ঠিক তেমনি বাকি পথটুকু অক্লেশে চলতে শেখালে। শুনেছি, ভারতের মোন্-জো-দড়োতে প্রথম চাকা আবিষ্কার হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেটা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে

আমরা এখনো যখন পাল্কী চড়ি তখন বোধ হয় সেই আদিম যুগে ফিরে যাই, যখন মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে শেখেনি। ছজন বেয়ারা একটি মেয়েকে বইতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে যায়, ঘড়ি ঘড়ি জিরোয় আর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়; ওদিকে একজন রিক্সওলা দুটো লাশকে দিব্য টেনে নিয়ে যায়—সবই চাকার কল্যাণে।

আবুল আস্‌ফিয়া বললেন, 'চাকা এরা আবিষ্কার করতে পারেনি সত্যি, কিন্তু হাতের নৈপুণ্যে এরা আর সবাইকে হার মানিয়েছে। এই যে হাজার হাজার টনী লক্ষ লক্ষ পাথর একটার গায়ে আরেকটা জোড়া দিয়েছে, সেখানে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগের কাজ। আজকের দিনের জহুরীরা, চশমা বানানেওলারাও এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে কি না সন্দেহ। আর জহুরীদের কাজ তো এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি মাল নিয়ে। এরা সামলেছে লক্ষ লক্ষ ইঞ্চি।'

আমরা শুধালুম, 'তা হলে তারা সে নৈপুণ্য কোনো সূক্ষ্ম কলা নির্মাণে কোনো সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রয়োগ করলো না কেন?'

আবুল আস্‌ফিয়া বললেন, 'সেটা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মন্দিরগাত্রে তাদের প্রস্তর মূর্তিতে।'

হায়, সেগুলো এখন দেখবার উপায় নেই।

পার্সি ততক্ষণে বালু জড়ো করে বালিশ বানিয়ে তারই উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তত্ত্বালোচনার প্রতি তার একটা বিধিদত্ত আজন্মলব্ধ নিরঙ্কুশ বৈরাগ্য আছে। স্বতই ভক্তিভরে মাথা নত হয়ে আসে।

আবুল আস্‌ফিয়া বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। শহরে ফেরা যাক।'

পল অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল। মোটরের দিকে যেতে যেতে বললে, 'আমার কিন্তু সমস্ত জিনিসটা একটা হিউজ ওয়েষ্ট বলে মনে হয়।' আমরা সবাই চুপ করে শুনলুম।

আমাদের দলের মধ্যে একটি প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন। তিনি বললেন, 'না, মসিয়ো পল। পিরামিডের একটা গুণ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। এর সামনে দাঁড়ালে, বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাকেও তরুণী বলে মনে হয়।'

একটা কথার মত কথা বটে।

আমি বললুম, 'শাবাশ!'

২০

মানুষের চেহারা জাগ্রত অবস্থায় এক রকম, ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য রকম। শহরের বেলাতেও তাই। জাগ্রত অবস্থায় কোনো মানুষকে বেশ চালাক-চতুর বলে মনে হয়, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেই দেখায় আস্ত হাবা গঙ্গারামের মত। দুপুর বেলা লালদিঘি গমগম করে, রাত্রে সেখানে গা ছমছম করে। আমাদের পাড়া পার্কসার্কাসের ট্রাম ডিপো অঞ্চল দুপুর বেলা ঘুমিয়ে পড়ে, সন্ধ্যায় হোটেলগুলো যেন কোরাস গান গেয়ে ওঠে।

রসের ক্ষেত্রে আমি ছেলে বুড়োতে তফাত করিনে। আট বছরের ছেলে মহাভারত পড়ে সুখ পায়, আশী বছরের বুড়োও আনন্দ পায়। আবার আট বছরের ছেলে দিব্য কীর্তন গেয়ে শুনিয়ে দিলে, ষাট বছরের সুরকানা পণ্ডিত ধরতে পারলেন না, সেটা কীর্তন না বাউল! অর্থাৎ রসবোধের ক্ষমতা বয়সের উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু কোনো কোনো ছোটখাটো রস বয়সের উপর নির্ভর করে। আট বছরে সিগরেট খেয়ে কোনো লাভ নেই, আঠারোতেই রাস্তায় মার্বেল খেলার রস শুকিয়ে যায়। ঠিক তেমনি রাতের শহর ছোটদের জন্য নয়। তুলনা দিয়ে বলি; সকাল আটটায় আট বছরের ছেলেকে আটখানা ট্যাকসি ডাকতে পাঠাতে পারি, কিন্তু রাত দশটায় দশ বছরের ছেলেকে দশ জায়গায় পাঠাতে পারিনে।

কিন্তু যে-সব দুর্দে ছেলেরা—যেমন পল পার্সি—রাত দুটোর সময় জেগে আছে, তাদের নিয়ে কি করা যায়? আবুল আস্‌ফিয় অভয় জানিয়ে বললেন, কাইরোতে এমন সব নাচের জায়গা আছে, যেখানে বাপ মা আপন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে যান।

তারই একটা 'কাবারে'-তে যাওয়া হল।

খোলাতে। উপরে মুক্ত আকাশ। চতুর্দিকে জাপানী ফানুসে ঢাকা রঙ-বেরঙের আলোর জ্যোতি ক্ষীণ বলে উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকালে গম্ভীর আকাশের গায়ে চটুল তারার মিটমিটে নাচ দেখা যায়।

শ খানেক ছোট ছোট টেবিল। এক প্রান্তে ষ্টেজ। ডাইনে বাঁয়ে উইঙ নেই, পিছনে শুধু হুবহু শুক্তির এক পাটির মত কিম্বা বলতে পারো, সাপের ফণার মত উঁচু হয়ে ডগার কাছে নিচের থেকে বেঁকে আছে ষ্টেজের বিরাট ব্যাকগ্রাউণ্ড। শুক্তিতে আবার ঢেউ খেলানো—এ রকম ছোট্ট সাইজের ঝিনুক সমুদ্র পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায়—দেখতে ভারি চমৎকার। ব্যাকগ্রাউণ্ডের পিছনে এরই আড়ালে গ্রীনরূম নাকি, না মাটির নিচে সুড়ুঙ্গ করে?

হঠাৎ সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। ভাবছি ব্যাপারটা কি। পল পার্সিকে কানে কানে বললুম, 'মনিব্যাগ চেপে ধরো।' বলাতো যায় না, বিদেশ বিভুঁই জায়গা।

নাঃ, আলো জ্বলতে দেখি, শুক্তির সামনে এক স্ফিনকস্। পিরামিডের পাশে আমরা এই স্ফিনকসের পাথরের মূর্তি দেখেছি—অবশ্য এর চাইতে পাঁচশো গুণে বড়। স্ফিনকস্ মিশরের সম্রাট ফারাওয়ের প্রতিমূর্তি। মুখটা রাজারই মত, শুধু শক্তি আর প্রতাপ বোঝানোর জন্য শরীরটা সিংহের।

পিছন থেকে বেরিয়ে এল দুটি মেয়ে। গলা থেকে পা অবধি ধবধবে সাদা শেমিজের মত লম্বা জামা পরা। রাস্তায় মিশরী মেয়েদের এ রকম জামা পরতে দেখেছি। তবে অন্য রঙের।

আস্তে আস্তে তারা স্ফিনকসের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করলো। বড় মৃদু পদক্ষেপ। পায়রা যে-রকম নিঃশব্দ পদসঞ্চারণে হাঁটে। চাঁদ যে রকম আকাশের উপর দিয়ে তারার ফুলকে না মাড়িয়ে আকাশের এপার ওপার হয়।

পায়ে ঘুঙর নেই, হাতে কাঁকন নেই। শুধু থেকে থেকে সমের একটু আগে তেহাইয়ের সময় থেকে বাঁশী, খঞ্জনী আর ঢোলের সামান্য একটুখানি সঙ্গীত। বড় করুণ, অতি বিষাদে ভরা। নাইলের এপার থেকে মা যেন ওপারের ছেলেকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার জন্য ডাকছে। এ ডাক আমি জীবনে বহুবার শুনেছি। যে মা-ই ডাকুক না কেন, আমি যেন সে ডাকে আমার মায়ের গলা শুনতে পাই।

সে ডাক বদলে গেল। এবারে শুনতে পাচ্ছি অন্য স্বর। এ যেন মা ছেলেকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করছে। এ গলায় গোড়ার দিকে ছিল অনুনয়-বিনয়। তার পর আরম্ভ হল আশা-উদ্দীপনার বাণী। সঙ্গীত জোরালো হয়ে আসছে। পদক্ষেপ দ্রুততর হয়েছে। ছটি নয় এখন মনে হচ্ছে যেন ষাটটি মেয়ে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে নৃত্যাঙ্গন অপূর্ব অলিম্পনে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। আর পদক্ষেপের কণামাত্র স্থান নেই।

স্বপ্নে অজানা লিপি, অচেনা বাণী মানুষ যেমন হঠাৎ কোন এক ইন্দ্রজালের প্রভাবে বুঝে ফেলে, আমি ঠিক তেমনি হঠাৎ বুঝে গেলুম নাচের অর্থটা কি। এ শুধু অর্থবিহীন পদক্ষেপ নয়, ব্যঞ্জনাহীন হস্ত-বিন্যাস নয়। নর্তকীরা নব মিশরের প্রতীক। এরা প্রাচীন মিশরের প্রতীক স্ফিন্‌ক্‌সকে তার যুগ-যুগান্তব্যাপী নিদ্রা থেকে জাগরিত করতে চাইছে। সে তার লুপ্ত গৌরব নিয়ে সুপ্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে আবার মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, বিদেশী স্বৈরতন্ত্রের কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করে সেই প্রাচীন সবিতার নবীন মূর্তি দ্যুলোক ভূলোক উদ্ভাসিত করুক।

তবে কি আমারই মনের ভুল? দেখি, স্ফিন্‌ক্‌স্ মূর্তির মুখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে। একি জাদুকরের ভানুমতী না সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক আশীর্বাদ?

আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

নিদ্রিতের চোখে যে রকম পড়ে, আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়ল পশ্চিমাকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্তছটা, আর পূর্বাকাশ থেকে নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস।

জয় মিশরভূমির জয়।

ইংরেজিতে কি যেন একটা প্রবাদ আছে,—

Early to bed and early to rise—

তার পর কি যেন সব হয় ? হ্যাঁ বাঙলাটা মনে পড়েছে ;—

সক ল সকাল শুতে যাওয়া সকাল বেলা ওঠা,

স্বাস্থ্য পাবে বিত্তে হবে, টাকাও হয় মোটা

গ্রামের তুলনায় শহরে টাকা বেশী, রাস্তায় রাস্তায় বিত্তের ভাণ্ডার ইস্কুল-কলেজ, আর শহরবাসীকে অজর অমর করে রাখবার জন্য কত ডাক্তার-কবিরাজ-হেকিম না খেয়ে মরছে তার হিসেব রাখে কে ? তাই বোধ হয় শহরের লোক সকাল সকাল শুতে যাওয়ার আর সকাল বেলা ওঠার প্রয়োজন বোধ করে না। গ্রামের লোক তাই এখনো ভোরবেলা ওঠে। কাইরো শহর তাই এখনো ঘুমুচ্ছে— অবশ্য নাক ডাকিয়ে নয়।

আবুল আস্‌ফিয়া বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু মুসলমানদের প্রথম নমাজ পড়তে হয় কাক-কোকিল ডাকার পয়লা। এদেশে তাদের বড় বড় মসজিদ-মাদ্রাসা অজহর পাড়ায়। সেখানেই যাওয়া যাক। তারা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে।'

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মসজিদের নমাজীদের দেখবার জন্য এই সুদূর কাইরো শহরে আসা কেন ? আপন কলকাতায় জাকারিয়া স্ট্রীটে গেলেই হয়!

উঁহু, সেইটেই নাকি কাইরোর প্রবীণ অঞ্চল। অবশ্য পিরামিডের তুলনায় অতিশয় নবীন—বয়স মাত্র এক হাজার বৎসর, কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক। প্রাচ্যের রোমান্টিক নগরী কাইরো বলতে জগজ্জনের

মনে আরবিস্থানের যে রঙীন তসবির ফুটে ওঠে সে বস্তু নাকি এখনো ঐ অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

ট্রাম কিন্তু তখনই চলতে আরম্ভ করেছে। কলকাতার ট্রামের তুলনায় অতিশয় লজঝড় এবং ছুটির দিনে ইস্কুল-কলেজের মত ফাঁকা।

পয়লা ট্রাম দেখা মাত্রই আবুল আস্‌ফিয়া তড়িঘড়ি ট্যাক্‌সিওলাদের পাওনা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন। পয়সা বাঁচাবার এ ফিকির সবাই জানে কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে জানে কোন ট্রাম কোথায় যায়? আপন কলকাতাতেই যখন ট্রামের গুবলেটে নিত্যি নিত্যি কালীঘাট যেতে গিয়ে পৌঁছে যাই মৌলা আলী, কিম্বা বলতে পারো মর মর অবস্থায় মেডিকেল কলেজে না পৌঁছে ট্রাম ভিড়ল নিমতলায়! 'বল্ হরি, হরি বল!'

আবুল আস্‌ফিয়া বললেন, 'আল্লা আছেন, ভাবনা কি,—

তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি
তোমারে ত্যজিয়া মসজিদে গিয়া
কি হবে মন্ত্র স্মরি!'

তবু খুব ভরসা পেলুম না। হরিই বলো আর আল্লাই বলো, তাঁরা সব ক-জনা এই কটা বাউণ্ডুলের জন্য অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ঠিক ট্রাম ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পাঠাবার তদারকিতে বসে আছেন —এ ভরসা করতে হলে যতখানি বিশ্বাসী হতে হয় আমি ঠিক ততখানি নই। তা হই আর না-ই হই, আর পাঁচ জনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রামেই উঠতে হল।

রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র যা হয়— খোলা-মেলার নূতন শহর থেকে নোংরা ঘিঞ্জি পুরানো শহরে ঢোকবার সময়।

রাস্তার দুদিকে দোকান-পাট এখনো বন্ধ। দু-একটা কফির দোকান খুলি-খুলি করছে। ফুটপাথের উপর লোহার চেয়ারের

উপর পদ্মাসনে বসে দু-চারটি সুদানী দারোয়ান তসবী টপকাচ্ছে, খবরের কাগজ-ওলার দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড়, চাকর-বাকররা হন্‌হন্‌ করে চলেছে বড় সায়েবদের বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছে বলে।

তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্য ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে। কালো চুলের মাঝখানে সাদা সিঁথি ফুটে উঠছে। তার উপর দেখা যাচ্ছে লাল সিঁদুরের পোঁছ। আকাশ বাতাসের এই লীলা-খেলাতে সব-কিছু যে পষ্ট পষ্ট দেখা গেল তা নয়, কিন্তু ট্রামের জানালার উপর মাথা রেখে আধো ঘুমে আধো জাগরণে জড়ানো জড়ানো হয়ে সব কিছুই   কছু দেখা হল। স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে মেশানো অভিজ্ঞতা ভাষাতে প্রকাশ করা কঠিন। ছবিতে এ জিনিস ফোটানো যায় অনেক অক্লেশে। তাই বোধ হয় চিত্রকরদের সূর্যোদয়ের ছবি, সাহিত্যের সূর্যোদয়কে প্রায়ই হার মানায়।

সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের চূড়ো (মিনার)-গুলোকে। কুৎ‌ব মিনার যারা দেখেছে তারাই জানে তার সৌন্দর্য কি! মনে হয় সে যেন পৃথিবীর ধুলো-মাটির প্রাণী নয়। সে যেন কোনো রাজাধিরাজের উষ্ণীষ—দেশের আপামর জনসাধারণের বহু ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে ভগবানের আপন হাতের অভিষেক আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছে।

তবু কুৎবের পা মাটিতে ঠেকেছে। এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লার নামাজের ঘর মসজিদের উপর। কিন্তু এরা জানে উপরের দিকে আল্লার কাছে যাওয়ার অর্থ কি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যত উপরের দিকে যাচ্ছে ততই ভয়ে জড়সড় হয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে—ক্লাশের গাব্দা-গোব্দা ছেলেও যে-রকম হেড মাস্টারের সামনে শর-কাঠিটি হয়ে যায়। কিন্তু দ্যোলোক আর সবিতা যেন ওদের অভয় দিচ্ছেন। আকাশ যেন তাঁর আপন নীলাম্বরী তাদের পরিয়ে দিতে এসেছেন—পিছনের দিকটা পরা হয়ে গিয়েছে, আর সবিতা যেন

অরুণালোর লম্বা লম্বা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেন। তাই দেখে ওমর খৈয়াম বললেন,

And lo! the Hunter of the East has caught
The Sultan's turret in a noose of light.

(Fitzgerald)

কান্তি ঘোষের ইংরিজি অনুবাদ সচরাচর উত্তম কিন্তু এ স্থলে আমি একটু আপত্তি জানাই। তাঁর অনুবাদে আছে,—

পূব-গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চ শির। (কান্তি ঘোষ)।

আসলে সূর্যালোক তীরের মতও মিনারের উপর আঘাত দিতে পারে আবার 'নূস্'—ফাঁসের মতও তাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। তফাত বিশেষ কিছু নেই আর 'পাগলা' কবিরা কত যে উদ্ভট উপমা দেয় তার কি ইয়ত্তা আছে? তবে কি না অনুবাদের বেলা মূলের যত কাছে থাকা যায় ততই মঙ্গল।(১)

প্রকৃতির গড়া নীল, আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভুবন-বিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পৃথিবীর বহু সমঝদার শুদ্ধমাত্র এই মসজিদগুলোকেই প্রাণভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কাইরোতে আসেন। পিরামিড যারা বানিয়েছিল তাদের বংশধররাই এ-সব মসজিদ তৈরী করেছে কিন্তু এদের গায়ে ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ ইরানী, গ্রীক, রোমান এবং পরবর্তী যুগে বিস্তর আরব-রক্ত ঢুকে পড়েছিল বলে এরা মসজিদগুলো বানিয়েছে ভিন্ন শৈলীতে। বিশেষতঃ—পূর্বেই বলেছি—পিরামিড তার লক্ষ লক্ষ মণ ওজন নিয়ে মাটির উপর ভারিক্কি চালে বসে আছে, তার রাজা প্রজাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত যে ভাবে বসতেন তারই অনুকরণ করে। পরবর্তী যুগের মসজিদ যারা

(১) স্বর্গীয় কান্তি ঘোষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আর বহু গুণীজনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এ-অধমও তাঁর অনুবাদে উচ্ছ্বসিত।

বানিয়েছিল তারা মুসলমান। তারা রাজার রাজা সৃষ্টিকর্তাকে দেয় সর্বোচ্চ স্থান। তাই তাদের মসজিদের মিনারগুলো উপরের দিকে ধেয়ে চলেছে দ্যুলোকেশ্বরের সন্ধানে। কিম্বা বলতে পারো তারা দাঁড়িয়ে আছে, মুসলমান নমাজ পড়ার সময় যে রকম প্রতিদিন পাঁচ বার সোজা হয়ে আল্লার সামনে দাঁড়ায়। তাই পিরামিডে ভীতিরস, মসজিদে গীতিরস।

পল পার্সি দেখলুম এ রসে ঈষৎ বঞ্চিত। আমরা পুরনো কাইরোর মাঝখানে পৌঁছতেই ট্রাম ছেড়ে একটা মসজিদের অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে আরম্ভ করেছি; ওরা দেখি, মা মাসীর তম্বীতে গিয়ে শীতের গঙ্গাস্নানের সময় আমরা যা করি তাই করছে। গঙ্গা যে সুন্দর সেটা স্বীকার করছে কিন্তু তাতে নিমজ্জিত হওয়ার আনন্দ সম্বন্ধে সন্দিহান।

পার্সি একটু ঠোঁটকাটা। হক্ কথা—অর্থাৎ যেটাকে সে হক্ ভাবে সেটা টক হলেও ক্যাট-ক্যাট করে বলতে পারে। পলের ভাবটা একটু আলাদা। অশ্বত্থামা যদি পিটুলি-গোলা খেয়ে সানন্দে তাণ্ডব নৃত্য জোড়ে তবে পার্সি তাকে তন্মুহূর্তে বলে দেবে যে দুধের বদলে তাকে ঘোল দিয়ে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে আর পল ভাববে, কি হবে ওর ভুল ভাঙ্গিয়ে তার আনন্দটি নষ্ট করতে, ও যে আনন্দ পাচ্ছে তাতে তো কারো কোনো লোকসান হচ্ছে না।

পার্সি বললে 'হুঁঃ! যত সব! পিরামিড? হ্যাঁ বুঝি। মোক্ষম ব্যাপার। চারটিখানি কথা নয়। পারি ও রকম একটা বানাতে? মানলুম, এ মসজিদটা সুন্দর কিন্তু এটা বানানো আর তেমন কি?'

পার্সিও মসজিদ দেখে বে-এক্কেয়ার হয়নি। সে কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এ যুক্তিটা তারও মনঃপূত হল না। শুধালে, 'পারো তুমি বানাতে?'

'আলবৎ'

আমি বললুম, 'সন্দেহের কিঞ্চিৎ অবকাশ আছে। আজকের দিনে যে-সব কল-কব্জা দিয়ে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তৈরী করা যায় তাই দিয়ে পিরামিড তৈরী করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকার্য আছে সে রকম করবার মত হাত আজকের দিনে আর কারো নেই। আর থাকলেই বা কি? সেটা তো হবে নকল। তুমি যদি একটা বিরাট দীঘি খোঁড়ো তবে এ কথা কেউ বলবে না, এটা অমুক দীঘির নকল। তুমি যদি একটা পিরামিড বানাও তবে কেউ বলবে না এটা পিরামিডের নকল, কারণ সব পিরামিডই হুবহু একই প্রকারের, কোনোটা বেশী বড় কোনটা কম বড়। কিন্তু তুমি যদি 'হ্যামলেট'-খানা নকল করে মাসিক পত্রিকায় পাঠাও তবে তারা ছাপবে না, বলবে নকল। তুলনাটা মনঃপূত হল না? তবে বলি, তুমি যদি মোনা লিজার ছবি পর্যন্ত হুবহু এঁকে ফেলো তবে সবাই বলবে, নকল, তবে ওস্তাদের হাত বটে, 'বাঃ।' কেউ বলবে না, 'আঃ'।'

পল শুধালে, 'বাঃ' আর 'আঃ'-এর মধ্যে তফাতটা কি?

আমি বললুম, 'যেখানে শুদ্ধ মাত্রের হাতের ওস্তাদী কিম্বা ঐ জাতায় কিছু একটা, যেমন মনে করো মাটির থেকে একশ হাত উপরে একটা দড়ির উপর হেঁটে চলে যাওয়া, কিম্বা মনে করো সিঙ্গিটার মুখের ভিতর আপন মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে দেওয়া, এক কথায় সার্কাসের তাবৎ কসরৎ দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলি, 'বাঃ!' পিরামিডের বেলাও তাই, বলি 'বাঃ।' কিন্তু অমিতাভের উত্তম প্রতিকৃতিতে তাঁর শান্ত প্রশান্ত মুখচ্ছবি কিম্বা মাদন্নার মুখে বিগলিত মাতৃরস দেখে আমরা রসের সায়রে ডুবতে ডুবতে বলি 'আঃ! কী আরাম! কী সৌন্দর্য!' 'বাঃ'-এর কেরদানি যতই কঠিন, যতই রোমাঞ্চকর হক না কেন তার শেষ মূল্য 'আঃ'-এর জিনিসের চেয়ে কম। এভারেস্টের চুড়োয় ওঠা যত কঠিনই হোক না, তার মূল্য তিয়াসী পথিককে এক পাত্র জল দেওয়ার চেয়ে অনেক কম। এই যে পার্সি বললে, সে পিরামিড

বানানোর মত কঠিন কর্ম করতে পারে না, সেইটেই সব কিছু যাচাই করার শেষ পরশ পাথর নয়। শেক্সপীয়র খুব সম্ভব দড়ির উপরে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে পারতেন না। তাই বলে ঐ কর্ম তার 'হ্যামলেটের' চেয়ে মূল্যবান এ রায় কে দেবে ? আসলে দুটো আলাদা জিনিস। তুলনা করাই ভুল। পিরামিডে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং হুনোর-হেকমৎ (স্কিল) আর মসজিদে আছে রসসৃষ্টি (আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন)।

ইতিমধ্যে দেখি একটি মিশরীয় জাব্বা-জোব্বা পরা ছাত্র আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হল।

২২

আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স পুরো-পাক্কা এক হাজার বৎসর। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, বার্লিন এর চেয়ে কয়েক শ বছরের ছোট। তবু আজ যে সব গুণীজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এঁরা ঐ-সব ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আজহর থেকে যাঁরা বেরোন তাঁদের নাম তো শুনতে পাইনে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিশরের গাঁধী বলতে যাঁকে বোঝায় সেই সা'দ জগলুল পাশা ছিলেন আজহরের ছাত্র। কিন্তু আর কারো নাম শুনতে পাইনে কেন ?

আশ্চর্য! মুসলমানরা যখন স্পেন দখল করল তখন তারা সেখানে আজহরের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ল। প্যারিস য়ুনিভার্সিটির গোড়াপত্তন যাঁরা করেন, তাঁদের অনেকেই লেখা-পড়া শিখেছিলেন স্পেনের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং প্রথম দিককার পাঠ্যপুস্তক-গুলো পর্যন্ত আরবী বই থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। আজ আর আজহরের নাম কেউ করে না, করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের।

কিন্তু আশ্চর্য হই কেন ? একদা এই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীকরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কছু শিখেছিল। পরবর্তী যুগে ইয়োরোপীয়েরা আমাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শিখল (লক্ষ্য করেছ বোধ হয় রোমান হরফে যখন I, II, X, XII, C.M. লেখ তখন শূন্যের ব্যবহার আদপেই হয় না) এবং তারই ফলে তাদের গণিত-শাস্ত্র কী অসাধারণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। আরবরা চরক সুশ্রুতের অনুবাদ করলে, আরো কত কী। একাদশ শতকে ভারত

আক্রমণকারী সুলতান মাহমূদের সভাপণ্ডিত অলবীরূনী সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা পড়ে সে যুগের মুসলিম জগৎ অবাক হয়ে ভারতবর্ষের গুণগান করেছিল। তারও পরবর্তী যুগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারা শীকুর উপনিষদ সম্বন্ধে ফার্সী বই লাতিনে তর্জমা হয়ে যখন ইয়োরোপে বেরলো তখন সে-বই নিয়ে ইয়োরোপে কী তোলপাড়ই না হয়েছিল। সে যুগের সেরা দার্শনিক শোপেনহাওয়ার তখন বলেছিলেন, 'এ-বই আমার জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে ভরে দেবে।' ঐ সময়েই বিশ্বকবি গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে ঘন ঘন 'সাধু, সাধু' বলেছিলেন।

এখনো ভারতবর্ষের, আজহরের পুরনো সম্পদের সম্মান ইয়োরোপীয়রা করে কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা শুধু সংস্কৃত কিম্বা মিশরে আরবীর চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের নাম কেউ করে না। তাঁরা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিশ্বজন বিমোহিত হয়ে পুনরায় 'সাধু, সাধু' রবে হুঙ্কার তোলে?

হায়, এঁদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। কেন ফুরলো? তার একমাত্র কারণ, এক বিশেষ যুগে এসে এঁরা ভাবলেন, এঁদের সবকিছু করা হয়ে গিয়েছে, নূতন আর কিছু করবার নেই, পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে খেলেই চলবে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক কথা,—এঁরা অন্যের কাছ থেকে আর কিছু শিখতে চান না। এঁদের দম্ভ দেখে তাই স্তম্ভিত হতে হয়।

আজহরের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিসিক্স্ কেমিস্ট্রি বটনি পড়ানো হয়?'

সে শুধালে, 'এ-সব কি?'

অনেক কষ্টে বোঝালুম।

সে বললে, 'ধর্মশাস্ত্রে যা নেই, তা জেনে আমার কি হবে?'

আমি বললুম, ‘অতিশয় হক্ কথা। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই, কিন্তু ভ্রাতঃ, তোমার পা যদি আজ আছাড় খেয়ে ভেঙে যায় আর ডাক্তার বলে, এক্সরে করে দেখতে হবে কোন্ জায়গায় ভেঙেছে, তখন কি ধর্মশাস্ত্রে এক্সরে-র কল বানাবার সন্ধান পাবে ?’

উত্তরে কি বলেছিল মনে নেই। ‘ধর্ম রক্ষা করবেন’ এই জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি, পল পার্সী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তত্ত্বালোচনা পার্সিকে বিকল করে সে-কথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু এস্থলে পল পর্যন্ত বিচল হয়ে পড়লো। আমি যখন একটু থেমেছি তখন দেখি তারা এক দোকানীর সঙ্গে দরদস্তুর করছে।

কি ব্যাপার ? মিশরের পিরামিডের ভিতর যে সব টুকি-টাকি জিনিস পাওয়া গিয়েছে তারই কিছু কিছু এখানে বিক্রি হচ্ছে। আমি বললুম, ‘এ-সব তো মহামূল্যবান জিনিস, ঔগুলো কেনার কড়ি আমাদের কাছে আসবে কোত্থেকে, আর মিশরী সরকার সেগুলো যাদুঘরে সাজিয়ে না রেখে বাজারে বিক্রি করবার জন্য ছাড়বেই বা কেন ?’ দোকানী বললে, ‘একই জিনিস এত অসংখ্য পিরামিডে এত বেশী পাওয়া গিয়েছে যে সেগুলো সরকার বাজারে ছেড়েছে—ভালোগুলো অবশ্য যাদুঘরে সাজানো আছে—এবং দামও তাই বেশী নয়।’

আমি কিনি কিনছি, কিনি কিনছি করছি, এমন সময় সেই আজহরের ছেলেটি আমার কানে কানে বললে, ‘তাই যদি হবে, তবে ওর দোকানের পিছনের কারখানাতে কি সব তৈরী হচ্ছে ? চলুন না, কারখানাটা দেখে আসবেন।’

আমি বললুম, ‘কি আর হবে দেখে ? জর্মনিতে তৈরী কাশ্মীরী শাল, জাপানে তৈরী ‘খাঁটি’ ‘অতিশয় খাঁটি’ ভারতীয় খদ্দর, কলকাতায় তৈরী জর্মন ওষুধ এসব তো বহু বার দেখা হয়ে গিয়েছে। ওর থেকে নূতন আর কি তত্ত্বলাভ হবে ?’

পল পার্সিকে বললুম, 'পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকলি করা আর এই জাল মাল তৈরী করাতে কোনো তফাত নে ’

পল বললে, 'মাস্টার ধরতে পারলে কান মলে দেন।'

আমি বললুম, 'সরকারও মাঝে মাঝে এদের কান মলে দেয়।'

তখন হঠাৎ খেয়াল হল, আজহরী ছেলেটি যে ফিস-ফিস করে কানে কানে কথা বলেছিল, সেটা বাঙলায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে শুধালুম, 'আপনি কি বাঙালী?'

সে বললে 'হাঁ'।

তার পর শুনলুম, বর্ধমানে বাড়ি, দশ বছর বয়সে এখানে সে এসেছে। বাঙলা প্রায় ভুলে গিয়েছে। আরো চার বছর অর্থাৎ সবস্থদ্ধ বারো বছর এদেশে কাটিয়ে ফের বর্ধমানে ফিরে যাবে।

সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে? এই আরবী বিদ্বের কদর তো ভারতবর্ষে নেই? তাতে অশ্চর্য হবারই বা কি? কাশী থেকে বারো বছর সংস্কৃত শিখে বর্ধমানে ফিরলে তার পাণ্ডিত্যেরই বা মূল্য দেয় কে? তাকেও তো সেখানে উপোস করতে হয়। একেও তাই করতে হবে। আজ আর প্রাচীন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে কেউ সম্মান করে না।

কিন্তু ছেলেটির দেখলুম তাই নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই। বাপ ধার্মিক লোক, ছেলেকে ধর্মশিক্ষা করতে পাঠিয়েছেন, তাই শিখে সে দেশে ফিরে যাবে, তার পর যা হবার তাই হবে।

দলের কেউ এ-দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, কেউ ও দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে। কেনাকাটা হচ্ছে অতি সামান্য। টুকি-টাকি নাড়া-চাড়াতে আনন্দ অনেক বেশী—খরচাও তাতে নেই। এই করে করে আমরা সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু হঠাৎ দলের একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের পোর্টসঈদের ট্রেন ধরতে হবে আটটায়। আবুল আস্‌ফিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন, 'চলুন'। কিন্তু তাঁর হাবভাবে কোনো তাড়া নেই।

অতি অনিচ্ছায় ট্রামে উঠতে হল। আজহরের ছেলেটি আমার সঙ্গে বাঙলা কথা কইতে পেয়ে আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। সেও চললো আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাষা এখন তার জীবনের মূলমন্ত্র, কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভাষা বাঙলার মায়া এত সহজে কাটানো যায়?

ঘ্যাচাঙ করে ট্রাম দাঁড়ালো। কি ব্যাপার? আগের একটা ট্রাম মোড় নিতে গিয়ে লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। বাদ বাকি সব ট্রাম তার পিছনে গড্ডালিকায় দাঁড়িয়ে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জনকয়েক লোক ছিটকে-পড়া ট্রামটাকে লাইনে ফেরত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার চেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে বেশী। লম্বা লম্বা আলখাল্লা উড়িয়ে রাস্তার ছেলে বুড়ো ট্রামটার চতুর্দিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর কত প্রকারেরই না উপদেশ, আদেশ অনবরত ট্রামের ভিতর বাহির ছুদিক থেকেই উপছে পড়ছে। দেশের হরির লুঠ এর কাছে লাগে কোথায়?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাটা রসিয়ে রসিয়ে দেখছি, এমন সময় দলের একজনের হুঁশ হল, আটটায় যে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমার দেহ-মন কিন্তু ঐ রণাঙ্গন থেকে তখন কিছুতেই সরছিল না। কারণ, ইতিমধ্যে দেখি, ট্রামটা কি পদ্ধতিতে ফের লাইনে তোলা যায় তাই নিয়ে ছুইটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। যারা ডিপো থেকে এতক্ষণে এসে পৌঁছেচে তারা বাতলাচ্ছে এক প্রকারের রণকৌশল, আর সব কটা ট্রামের ড্রাইভার, কণ্ডাক্‌টরের দল সে রণকৌশলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করছে অস্ত্র জিহাদ। ব্যাপারটা তখন এমনি চরমে পৌঁছেচে যে উভয়পক্ষ তখন লোহার ডাণ্ডা হাতে করে মুখোমুখি হয়ে সদম্ভে সগর্বে সর্বপ্রকারের আস্ফালন কর্ম সুষ্ঠু পদ্ধতিতে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ছুই দলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামের যাত্রী এবং রাস্তার লোক। আর রাস্তার ছোঁড়ারা আলখাল্লা উড়িয়ে তাদের চতুর্দিকে পাঁই-পাঁই করে ঘুরছে, বোঁ করে মধ্যিখান দিয়ে

ইস্‌পার-উস্‌পার হয়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ে কখনো বা দু-একটা চড়ও খাচ্ছে।

একটা 'ফাস্‌টো কেলাস্' লড়াইয়ের পূর্বরাগ কিম্বা পূর্বাভাস!

কিন্তু হায় পৃথিবীর কত সৎকর্মই না অসম্পূর্ণ রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নিধিরামকে একদিন মোকা-মাফিক আচ্ছাসে উত্তম-মধ্যম দেব, তার পূর্বেই তো ম্যাট্রিক পাশ করে ইস্কুল ছাড়তে হল! আর নিধে রাস্কেলটা ফেল মেরে পড়ে রইল ইস্কুলে। কী অন্যায় অবিচার! নিধেটা লেখাপড়ায় একটা আস্ত বিদ্যাসাগর, সে কথা জানি, কিন্তু আরো কত খাটাশও তো ম্যাট্রিক পাশ করে। ও করলেই বা কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? আমিও তো দুটো কিল মারার সুযোগ পেতুম। এই সব অবিচার দেখে সংসারের প্রতি আমার তখন ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

আজও তাই হল। দলের লোকের তাড়ায়। তখন আর বেশী সময় হাতে নেই। ট্যাক্‌সি নিতে হল।

বুকিং আপিসের সামনে যাত্রার দলের হনুমানের ন্যাজের মত প্যাঁচ পাকানো কিউ—Q। কেউ কেউ ওটাকে U বলে বলে Wও বলে থাকেন, কারণ জায়গার অভাব থাকলে কিউ সচরাচর এই রকম শেপ-ই নিয়ে থাকে। অথচ গাড়ি ধরার সময় তখন মাত্র পাঁচ মিনিট। আবুল আস্‌ফিয়া কিউ-এতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বললুম, 'ট্রেন মিস্ নির্ঘাত।' তিনি বললেন, 'আপনারা স্টেশনে যান।'

স্টেশনে কখন কোন্ প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তার খবর নিয়ে যখন সেই প্ল্যাটফর্মের মুখে দাঁড়ালুম, তখন গেট-চেকার ভাঙাভাঙা ইংরাজিতে শোধালে,—

'আপনারা যাবেন কোথায়?'

'পোর্টসঈদ।' (সমবেত সঙ্গীতে)

'তবে ট্রেনে গিয়ে আসন নিচ্ছেন না কেন?'

তাই শুনে পড়ি-মরি হয়ে এক দল দিল ছুট ট্রেনের দিকে, আরেক দল যাবে কি যাবে না এই ভাবে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইল দাঁড়িয়ে, নড়লুম না আমরা তিন জন, পল, পার্সি আর আমি।

পল বললে, 'আমাদের টিকিট এখনো কাটা হয় নি।'

চেকার ছোকরা বললে, 'আপনারা যান।'

মনে হল ছোকরাটি বুদ্ধিমান। আমাদের চেহারা-ছবি দেখে এঁচেছে, আমরা ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চড়ার তালে নই। আমরা যখন পয়সা দেবার জন্য তৈরী তখন আমাদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মন তখন যাব যাব করছে। তখন পলের কথাতে বুঝলুম, সে কতখানি ভদ্র ছেলে। আমাকে বললে 'আবুল আস্‌ফিয়াকে ছেড়ে আমরা যাবো না।'

সেই উৎকট সঙ্কটের সময়ও আমার মনে পড়ল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিশেষ অবস্থায় স্বর্গে যেতে রাজী হননি।

আমাদের চোখের সামনে স্টেশনের বিরাট ঘড়ি। সেটা তখন দেখাচ্ছে, ৭, ৫৯।

কলাপ্‌সিবল্‌ গেটের ভিতর দিয়ে দেখছি, আমাদের ট্রেনের গার্ড বীরোচিত ধীর পদে টহল দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ট্যাঁকঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

মিশর তো প্রাচ্য দেশ, আরামের দেশ, অনপনকৃচুলায়িটির দেশ। ওরা আবার সময় মত গাড়ি ছাড়ার যাবনিক পদ্ধতি শিখল কোথা থেকে? সংসারের অবিচারের প্রতি আবার আমার ঘেন্না ধরলো। ট্রেন তো বাবা, সর্বত্রই নিত্যি নিত্যি লেট যায়। এই যে সোনার মুল্লুল ইংলণ্ড, যার প্রশংসায় এ পোড়ার দেশের সবাই পঞ্চমুখ দশানন, সেই দেশ সম্বন্ধেই শুনেছি, এক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন রোজ লেট যেত এবং বেচারী তাই নিয়ে অনেক আবেদন-ক্রন্দন

করার পর একদিন সত্যি সত্যি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে ট্রেন স্টেশনে এল। লোকটি উল্লাসভরে স্টেশন-মাস্টারকে কন্‌গ্রাচুলেট করাতে মাস্টার বিমর্ষ বদনে বললে, 'এটা গত কালের ট্রেন; ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা লেট।'

সেই পরানের ছ্যাশ বিলেতেই যদি এই ব্যবস্থা তবে এই খানদানী গেরেমভারী মিশরে মানুষ কি শুদ্ধমাত্র আমাদের দলকে ভ্যাংচাবার জন্যই কণ্টকে কণ্টকে ট্রেন ছাড়তে চায়?

দেখি, গার্ড সাহেব দোতুল্যমান গতিতে আমাদের দিকে আসছে। চেকারকে কি যেন শুধালে, তার পর উত্তর শুনে আমাকে বললে, 'আর তো সময় নেই, গাড়িতে উঠুন।'

লোকটির সৌজন্য আমি সম্মোহিত হয়ে গেলুম। কে আমরা আমাদের জন্য ওর অত দরদ কিসের? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমরা মার্কিন টুরিস্ট নই যে তাকে কাঁড়া-কাঁড়া সোনার মোহর টিপ্‌স্‌ দেব। মিশরের ট্রেন লোহালক্কড়ের বটে, কিন্তু মিশরীয় গার্ডের দিল মহব্বতে খুনে তৈরী।

আমি পাগল-পারা খুঁজছি সৌজন্য ভদ্রতার আরবী, তুর্কী ফার্সী বাক্য, যা দিয়ে আমি তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। ইংরিজিতে তো আছে শুধু, ছাই, 'থ্যাঙ্কু' ফরাসীতে 'মেসি' 'মের্সি', জর্মনে ও নাকি 'ডঙ্কি' না 'ডাঙ্কে' কি যেন একটা আছে কিন্তু ঐ সামান্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে গার্ড-সায়েবের সৌজন্য-সমুদ্রে আমার হাল পানি পাবে কেন?

তবুও তেরিয়া হয়ে বলে গেলুম, 'আনা উশকুরুকুম', 'চোক তশক্কুর এদরং এফেন্দং', 'খৈলি তশক্কুর মিদমহাতান্‌, কুরবান্‌' আরো কত কী, উল্টা-সুল্টা। তার মোদ্দা অর্থ, 'মহাশয় যে সৌজন্য দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তব্যাপী অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কিন্তু হাল্‌ফিল্‌ আমরা লৌহবর্ত্মশকটে আরোহণ করিতে অক্ষম যেহেতুক্‌ আমাদের পরমমিত্র চরমসখা শ্রীশ্রীমান

আবুল আসফিয়া নূরুদ্দীন মহম্মদ আব্দুল কাদিম সিদ্দীকীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

সঙ্গে সঙ্গে আরবী, তুর্কী, ফার্সী তিন ভাষাতেই বিস্তর ক্ষমা ভিক্ষা করলুম।

আর মনে মনে মোক্ষম চটছি আবুল আস্ফিয়ার উপর। লোকটার কি কণামাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই? দলের নেতা হয়ে কোনো রকম দায়িত্ব বোধ নেই? সাধে কি ভারতবর্ষ স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত!

হঠাৎ পল পার্সি দিল ছুট। তারা আবুল আস্ফিয়াকে দেখতে পেয়েছে। এবং আশ্চর্য, লোকটা তখনো নিশ্চিন্ত মনে রেলের এক কর্মচারীকে স্টেশনের বড় ঘড়িটা দেখিয়ে দেখিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে কচু! নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে, ওদের ঘড়ি ফাস্ট্ যাচ্ছে। তা যাচ্ছে তো যাচ্ছে, সে কথা বুঝিয়ে কি তোমার টাকেতে চুল গজাবে —ওদিকে ট্রেন মিস করে?

কথার মাঝখানেই পল আর পার্সি পিছন থেকে তাঁকে দুহাতে ধরে দিলে হ্যাঁচকা টান। তার পর দিল ছুট গাড়ির দিকে। আমিও পড়ি-মরি হয়ে সেদিকে। দলের যারা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়েছিল তারাও জয়োল্লাসে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে। আবুল আস্ফিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। স্টেশনের আন্তর্জাতিক জনতা যে যার পথ ভুলে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। পুলিস দিয়েছে হুইস্ল্। তবে কি দিনে-দুপুরে কিড্ন্যাপিং! কিন্তু এতো,

'উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম,
কারে কর্লি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম?'

এখানে তো বুড়ো-ধাড়িকে পাকড়ে নিয়ে চলেছে দুটো চ্যাংড়া!

গাড়ি ঠিক সময়ে ছেড়েছিল না লেটে, আবুল আস্ফিয়ার ঘড়ি ঠিক না রেলের ঘড়ি ঠিক এ সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান হল না। গার্ডসায়েব যে ভাবে পিছন থেকে পাকা হাতে আমাদের ধাক্কা দিয়ে

দিয়ে গাড়িতে ওঠালে তার থেকে অনুমান করলুম, এ প্রকারের কর্ম করে করে তার হাত ঝানু হয়ে গিয়েছে।

আবুল আস্‌ফিয়া তখনো পলকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তাঁর ঐ ঘড়িটাই স্যুইটজারল্যাণ্ডের ক্রনোমিটার পরীক্ষায় পয়লা প্রাইজ পেয়েছিল। মিশরীদের সময়-জ্ঞান নেই। আমরাও অতিশয় সরল। চিলে কান নিয়ে গেল শুনেই—

২৩

আহা! সুন্দর দেশ!

খালে নালায় ভর্তি। গাড়ি মিনিটে মিনিটে গম্, গড়ম্, গড়ড়ম্ করে সে সব নালার উপর দিয়ে পেরুচ্ছে। তারপর গাড়ি বলে 'বড্‌ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো,' 'বড্‌ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো,' তারপর ফের নালার উপর 'গম', 'গড়ম্', 'গড়ড়ম।' আর গাড়ির শব্দ যে এত মিষ্টি কে জানতো? এ ট্রেন মিস করলে আর দেখতে হত না।

খাল নালা তো বললুম, কিন্তু এক একটা নদ নদী এমনই চওড়া যে বোধ করি সেগুলো নীলেরই শাখা-প্রশাখা। আর সেগুলোতে জলে-ডাঙার মাঝখানে ফাঁক প্রায় নেই। নিতান্ত বর্ষাকাল ছাড়া আমাদের নদীর জল যান তলিয়ে, আর পাড়গুলো থাকেন খাড়া হয়ে। সে জল অত নিচু থেকে উপরে তোলা যায় না বলে সে জল থেকেও নেই। চাষী তাই দিয়ে শীতকালে আরেকটা ফসল তুলতে পারে না। এদেশের লোক সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে চাষবাস শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একমাত্র নদী নীলের গা থেকে এত হাজার হাজার খাল নালা কেটে রেখেছিল যে সে নদী গভীর হবার সুযোগ পায়নি এবং ফলে নাইলের জল দেশটাকে বারো মাস টৈটম্বুর করে রাখে।

ক্ষেতভরা ধান গম কাপাস! সবুজে সবুজে ছয়লাপ। মাঝে মাঝে খেজুরগাছের সারি, আর কখনো বা এখানে একটা সেখানে একটা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেতের পাহারা দিচ্ছে।

আর নদীর উপর দিয়ে চলেছে উঁচু উঁচু তেকোণা পাল তুলে

দিয়ে লম্বা লম্বা নৌকো। এ দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না বলে নৌকোতে ছইয়ের ব্যবস্থা প্রায় নেই। জোর হাওয়ায় নৌকোগুলো চলেছে দ্রুতগতিতে। পালের দড়ি ছিঁড়ে গেলে নৌকো যে ডুবে যাবে সে ডরভয় এদের নেই। তবে বোধ করি এদেশে দমকা হাওয়া হঠাৎ এসে নৌকোকে এলোপাতাড়ি ধাক্কা লাগায় না।

সবুজ ক্ষেত, নানারঙের পাল, ঘোর ঘন নীল আকাশ, চল্ চল্ ছল্ ছল্ জল মনটাকে গভীর শান্তি আর পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে দেয়। গাড়ির জানলার উপরে মুখ রেখে আধ-বোজা চোখে সে সৌন্দর্যরস পান করছি, আর ভাবছি, এই সৌন্দর্য দেখার জন্যেই তো বহুলোক রেলগাড়ি চড়বে, আমি যদি এদেশে থাকবার সুযোগ পেতুম তবে প্রতি শনিবারে রেলে চড়ে যে দিকে খুশী চলে যেতুম। কিছু না, শুধু নৌকো, জল, ক্ষেত আর আকাশ দেখে দেখে দিনরাত কাটিয়ে দিতুম।

রাতের কথায় মনে পড়ল, চাঁদের আলোতে এ সৌন্দর্য নেবে অন্য এক ভিন্ন রূপ। সেটা দেখবার সুযোগ হল না—এখানটায়, এবারে।

মাঝে মাঝে নদী, নৌকো, খেজুরগাছ সব-কিছু ছাড়িয়ে দেখা পাই সেই তিনটে বিরাট পিরামিড। কত দূরে চলে এসেছি তবু তারা মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে, আবার কাছের গাছের পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার মুখ দেখাচ্ছে। তখনই বুঝতে পারলুম, পিরামিডগুলো কত উঁচু। কাছের থেকে যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি।

কম্পার্টমেণ্টের মাঝখান দিয়ে চলাফেরার পথ—কলকাতার ট্রাম গাড়িতে যে রকম। সেই পথ দিয়ে যে কত রকমের ফেরিওলা এল গেল তার হিসেব রাখা ভার। কমলালেবু, কলা, রুটি থেকে আরম্ভ করে নোটবুক, চিরুনি, মোজা, ঘড়ি, লটারির টিকিট হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা দুচার বার না দেখালে—মনে হল লোহার সিন্দুক এবং

আস্ত মোটর গাড়ি মাত্র এই দুই বস্তুই বোধ করি ফেরি করা হল না।

এক কোণে দেখি জাব্বা-জোব্বা-পরা এক মৌলানা সায়েব হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাঁকে ঘিরে বসেছে এক পাল ছোকরা—তারাও পরেছে জাব্বা-জোব্বা, তাদের মাথায় ও লাল ফেজ টুপিতে প্যাঁচানো পাগড়ি। দু-চারজন সাধারণ যাত্রীও দলে ভিড়ে বক্তৃতা শুনছে। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম, ইনি আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছুটিছাটায় যখন গ্রামের বাড়ি যান তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে তাঁরই বাড়ি যায়। সমস্তক্ষণ চলে জ্ঞানচর্চা। ট্রেনের অন্য লোকও সে শাস্ত্র-চর্চা কান পেতে শোনে।

উত্তম ব্যবস্থা। প্রাচীন যুগে গুরুগৃহে বাস এবং বর্তমান যুগের কলেজে গিয়ে পড়াশুনো করা দুটোর উত্তম সমন্বয়। মাঝখানে থার্ডক্লাস গাড়ির প্যাসেঞ্জার, চাষাভূষোরাও এদের জ্ঞানের কিছুটা পেয়ে গেল। আমাদের দেশের চাষারা তো প্রফেসরদের জ্ঞানের একরত্তিও পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওলার কাছ থেকে কলামুলো কিনে নিয়ে মৌলানা সায়েব খাচ্ছেন, ছেলেদেরও খাওয়াচ্ছেন। সেও পরিপাটি ব্যবস্থা।

হরেকরকম ফেরিওলাই তো গেল। এখন এলেন আরেক মূর্তি। মুখে এক গাল হাসি—আপন মনেই হাসছে—পরনে লজঝড় কোট-পাতলুন, নোংরা শার্ট, টাইয়ের 'নট্' টা ট্যারচা হয়ে কলারের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, আর হাতে এক তাড়া রঙিন ছবিতে ভর্তি হ্যাণ্ডবিল-প্যাম্ফ্লিট্।

কেন যে আমাকেই বেছে নিলে বলতে পারবো না। বোধ হয় আমাকেই সব চেয়ে বেশী বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। ফেরিওলারা বোকাকেই সক্কলের পয়লা পাকড়াও করে এ তো জানা কথা।

এক গাল হাসির উপর আরেক পোঁচ মুচকি হাসি লেপটে দিয়ে শুধালে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে স্যর ?'

ইয়োরোপিয় জাহাজ চড়ে মেজাজ খানিকটে বিলিতি রঙ ধরে ফেলেছে। বলতে যাচ্ছিলুম, তোমার তাতে কি ? কিন্তু মনে পড়ল, মিশর প্রাচ্য দেশ, এ প্রশ্ন শুধনো অভদ্রতা কিম্বা অনধিকার প্রবেশ নয়। বললুম, 'পোর্ট সঈদ।'

'তার পর ?'

মোগলাই মেজাজ চেপে নিয়ে বাঙালী কণ্ঠে বললুম, 'ইয়োরোপ।'

'ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু ইয়োরোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে এই মিশরের পাশের দেশ প্যালেস্টাইনটা ঘুরে আসুন না।' আমি তো একেবারে থ। হরেকরকমের ফেরিওলা তো দেখলুম। কেউ বিক্রি করে ছ পয়সার জুতোর ফিতে, কেউ বিক্রি করে পাঁচ শ টাকার সোনার ঘড়ি কিন্তু একটা আস্ত দেশ বিক্রির জন্য তার আড়কাটি ট্রেনের ভিতর ঘোরাঘুরি করবে, এ ও কি কখনো বিশ্বাস করা যায় ? তবু ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য শুধালুম, 'আপনি বুঝি দেশ বিক্রি করেন ?'

সে আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আরেক গাল হেসে তার হাতের তাড়ার ভিতর থেকে কি একটা খুঁজতে আরম্ভ করলে। ইতিমধ্যে আমার পাশের ভদ্রলোক তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সে ঝুপ করে বসে পড়ে তার হাতের ডাঁই থেকে বের করলে প্যালেস্টাইনের হরেকরকম ছবিওলা একখানা রঙচঙা প্যাম্ফ্লিট। তার উপর দেখি মোটামোটা অক্ষরে লেখা প্যালেস্টাইন 'Palestine, The Land of the Lord', 'প্রভুর জন্মভূমি' ইত্যাদি আরো কত কী! তারপর বললে, 'দেশ বিক্রি করি ? হ্যাঁ, তাই বটে, তবে কি না আপনি যে ভাবে ধরেছেন, ঠিক সে ভাবে নয়। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখুন তো, কী চমৎকার দেশে

আপনাকে যেতে বলছি। যে-দেশে প্রভু জীজাস্ ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি নিশ্চয় প্রভুর—'

আমার ভারি বিরক্তি বোধ হল। এসব লোক কি ভাবে? ভারতবর্ষের লোক যীশুর নাম শোনেনি? তেড়ে বললুম, 'The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat'—ইত্যাদি ইত্যাদি,—চড়চড় করে মথি-লিখিত সুসমাচার থেকে মুখস্থ বলে যেতে লাগলুম, প্রভু যীশুর ঠিকুজি কুলজি। লোকটা কিন্তু একদম না দমে গিয়ে বললে, 'ঠিক, ঠিক। এই দেখুন, সেই জায়গা যেখানে প্রভু জন্ম নিলেন। একটা সরাইয়ের আস্তাবলে। মা মেরি আর তাঁর বর যোসেফ তখন প্যালেস্টাইন থেকে এই মিশরের দিকে পালিয়ে আসছিলেন। বেৎলেহেম গ্রামে সন্ধ্যা হল। সরাইয়ে জায়গা না পেয়ে মা-মেরি আশ্রয় নিলেন আস্তাবলে। এই দেখুন সেই আস্তাবলের ছবি। কত চিত্রকরই না এ ছবি এঁকেছেন। কত যুগ ধরে। তার পর দেখুন, নাজারেৎ গ্রামের ছবি। যোসেফ সেখানে ছুতোরের কাজ করতেন, আর মা-মেরি যেতেন জল আনতে। এই দেখুন—'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার মুশকিলটা আদপেই বুঝতে পারেননি। আমি যদি পোর্টসঈদ থেকে 'প্রভুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে' চলে যাই তবে সেখানে ফিরে এসে ইয়োরোপে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে জাহাজের টিকিট কাটতে হবে। তার পয়সা দেবে কে?—না হয় প্যালেস্টাইন তীর্থ-দর্শন-খর্চা আমি কোনো গতিকে, কেঁদে-কোকিয়ে সামলে নিলুম। এক জাহাজের টিকিট একই জায়গা যাবার জন্য দু-দুবার কাটবার মত পয়সা কিন্তু আমার নেই।'

আড়কাঠি তো হেসেই কুটিকুটি। আমি বিরক্ত। নিজকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'জাহাজের ডবল ভাড়া লাগবে কেন? আপনি যে জাহাজে করে পোর্টসঈদে এসেছেন সেই কোম্পানিরই

আরেকখানা জাহাজ পনেরো দিন পর সেখানে এসে ইয়োরোপ যাবে। আপনি সে জাহাজে গেলেন কিম্বা এ জাহাজে গেলেন তাতে কোম্পানির কি ক্ষতিবৃদ্ধি? ডবল পয়সা নিতে যাবে কেন? আর ঐ পনেরো দিনে আপনি দেখে নেবেন প্যালেস্টাইন।'

আমি বললুম, 'হুঁ, হুঁ-উ-উ—কিন্তু সে জাহাজে যদি সীট না থাকে?'

লোকটার ধৈর্যও অসীম। সর্বমুখে বুদ্ধদেবের মত করুণার হাসি হেসে বললে, 'কে বলবে থাকবে না? এখন তো অফ্ সীজ্ন্, স্ল্যাক পিয়েরিয়েড, অর্থাৎ যাত্রীর ভিড় নেই। আপনি যে জাহাজ এলেন তার কি আর্ধেকখানা ফাঁকা ছিল না। আসছে জাহাজ গড়ের মাঠ।'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। চিন্তাশীল লোক বলে নয়। আসলে সব কিছু বুঝতেই আর পাঁচ জনের তুলনায় আমার একটু বেশী সময় লাগে। ব্রেন-বক্সে আল্লাতালা রিসিভিং সেট্টা দিয়েছেন অতিশয় নিকৃষ্ট পর্যায়ের। বাল্বগুলো গরম হতে লাগে মিনিট তিন। তার পরও চিত্তির। তিনটে স্টেশন গুবলেট পাকিয়ে দেয় শুধু কড়া শিষ। কিছুই বুঝতে পারিনে।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল। জানো বোধ হয়, অগা বোকারা মাঝে মাঝে, অর্থাৎ বছরে দুএকবার, পাকা স্যানার মত দুএকটা প্রশ্ন ওঠাতে পারে। তাই শুধালুম, 'কিন্তু আমি প্যালেস্টাইন গেলে তোমার টাকে কি চুল গজাবে? তোমার তাতে কি লাভ?'

লোকটা এইবারে একটু বিরক্ত হল। প্রশ্নটা মোক্ষম কঠিন বলে, না 'টাক টাক' করলুম বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমার মগজ তখন ঐ একটা কঠিন প্রশ্ন শুধবার ধকল কাটাতে গিয়ে হাঁপাতে আরম্ভ করছে।

বললে, 'আমার কি লাভ? আমার লাভ বিস্তর না হলেও অল্প। অর্থাৎ অল্প-বিস্তর। বুঝিয়ে বলি। আপনাকে নিয়ে যাবো

কুকের আপিসে। তাদের কাছ থেকে কাটবেন আপনার পয়লা গন্তব্যস্থল, প্যালেস্‌টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের টিকিট। ন্যায্য ভাড়াই দেবেন। কিন্তু কুক্‌ আমাকে দেবে কমিশন—'

আমি শুধালুম, 'কুক্‌ তোমাকে কমিশন দিতে যাবে কেন?'

আমার বুদ্ধির 'প্রাখর্য' দেখে লোকটা প্রায় হতাশ হয়ে বললে, 'প্যালেস্টাইন সরকার কুককে পয়সা দেয়, তার দেশে টুরিস্‌ট্‌ নিয়ে যাবার জন্য—তাতে করে সরকারের দুপয়সা লাভ হয়। তাই তারা কুককে দেয় কমিশন, কুক্‌ তার-ই খানিকটে দেয় আমাকে। তারা তো আর ট্রেনে ট্রেনে খদ্দেরের সন্ধানে টো টো করতে পারে না। ঐ কর্মটি করি আমি। তাই আমার হয় কিঞ্চিৎ মুনাফা। বুঝলেন তো?"

পাছে লোকটা আমাকে ফের বোকা বানিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি, বিলক্ষণ বুঝেছি।' যদিও আমি ততখানি সংসারী বুদ্ধি ধরিনে বলে ঐসব কমিশন ফমিশনের মারপ্যাঁচ আদপেই ধরতে পারিনি।

কিন্তু লক্ষ্য করলুম, সে প্যাটপ্যাট করে আমার হ্যাণ্ড-ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার উপরে মোটামোটা হরফে লেখা ছিল ALI, লোকটা শুধলে, 'ব্যাগটা আপনার?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'বাঃ। তা হলে তো আপনি মুসলমান। আর জেরুজালেম মুসলমানদের তীর্থভূমি—মক্কার পরেই তার স্থান। আল্লাতালা মুহম্মদ সায়েবকে রাত্রে আরব থেকে জেরুজালেমে এনে সেখান থেকে স্বর্গদর্শনে নিয়ে যান। জেরুজালেমের সে জায়গাটার উপর এখন মস্‌জিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা। বিরাট সে মসজিদ, অদ্ভুত তার গঠন। এই কিছুদিন হল আপনাদের দেশেরই রাজা হাইদ্রাবাদের নিজাম সেটাকে দশলক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করে দিয়েছেন। দেখতে যাবেন না সেটা?'

তারপর বললে, 'আসলে কি জানেন? আসলে জেরূজালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী। ইহুদী, খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে। এক ঢিলে তিন পাখি।'

তীর্থ দেখলে পুণ্য হয়, কি না হয়, সে কথা আমি কখনো ভালো করে ভেবে দেখেনি। কিন্তু হিন্দুদের কাশী, বৌদ্ধদের রাজগীর যখন দেখেছি, তখন এ-তিনটেই বা বাদ যাবে কেন? বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমি আদপেই পছন্দ করিনে। তাকেই বলে কমুনালিজম। সৃষ্টিকর্তা যখন তাঁর অসীম করুণায় এতগুলো ধর্ম বানিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সব-কটাতেই কিছু-না-কিছু আছে। আর বিশেষ করে মা ভারি খুশী হবে, যখন শুনবে আমি বয়ৎ-উল্-মুকদ্দস্ ('পুণ্যভূমি' অর্থাৎ জেরূজালেম) দর্শন করেছি। তাঁর বাবাও মক্কা অবধি পৌঁছতে পেরেছিলেন—বয়ৎ-উল্-মুকদ্দস্ দেখেননি। সেখানে শুনেছি, অতি উত্তম তসবী (জপমালা) পাওয়া যায়। এক গাছা কিনে দিলে মা যা খুশী হবে। সাত রকৎ নমাজ পড়ার সময় (মুসলমানরা সচরাচর পড়ে পাঁচ রকৎ—মা পড়ে সাত) মা তসবী গুনবে, আর আমার উপর ভারি খুশী হবে।

* * * *

পল আর পার্সি অবশ্য অত্যন্ত দুঃখিত হল। পার্সি বললে, 'আমাদের ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইন! আপনি না বলেছিলেন, ভূমধ্যসাগরের নানা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাবেন, ইটালি আর সিসিলি, তার পর কর্সিকা আর সার্ডিনিয়ার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবার সময়, ভিসুভিয়স, আরো কত কী দেখাবেন?'

আমি স্বার্থপর, পাষণ্ড। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলুম। তবু হাতজোড় করে মাপ চাইলুম।

পল পার্সির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছিঃ, পার্সি! স্যর ধর্মের জায়গা দেখতে ভারি ভালোবাসেন। এ সুযোগ ছাড়বেন কেন?'

তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।
এক দিকে বন্ধুজন, আরেক দিকে মায়ের তসবী।
সংসার কি শুধু দ্বন্দ্বেতেই ভরা ?

পরিশিষ্ট

প্যালেস্টাইন ভ্রমণ যে এ পুস্তকের অংশ হতে পারতো না তা নয়। কিন্তু পল আর পার্সি সঙ্গে না থাকলে সে বই তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে ভালো লাগবে না বলে আমার বিশ্বাস। সে-বই হয়ে যাবে নিতান্তই বয়সীদের জন্য।

মানুষ বই লিখে বন্ধুজনকে উৎসর্গ করে। আমি প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে না-লেখা ভ্রমণ-কাহিনী উৎসর্গ করলুম মিত্রদ্বয় পল এবং পার্সিকে।

সমাপ্ত